আমেরিকান পুলিশ

– করিম চৌধুরী

নিউ ইয়র্ক থেকে শিরিনআপা ফোন করে বললেন, আমার এক বান্ধবী মায়ামি যাচ্ছে ওনার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। ওনার মেয়ে কলোরাডো থেকে ট্রান্সফার নিয়ে মায়ামি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আপনার ফোন নাম্বার দিয়েছি। হয়তো তিনি যোগাযোগ করবেন।

পরদিন ভদ্রমহিলা মায়ামি থেকে ফোন করে পরিচয় দিলেন। নাম লিলি। আমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন মায়ামি গিয়ে ওনার সঙ্গে দেখা করি। সৌজন্য সাক্ষাৎ। তবে কণ্ঠে অনুরোধের সুর।

বললাম, লিলিআপা, উইকডে-তে (সোমবার থেকে শুক্রবার) আমার ছুটি নেই। যদি ছুটি নিতে পারি তাহলে আসবো।

কিভাবে যেতে হবে তার বর্ণনাসহ বাসার ঠিকানা ও লোকেশন তিনি জানিয়ে দিলেন। আমি যে সিটিতে থাকি সেখান থেকে মায়ামি-র দূরত্ব ২১০ মাইল। কমপক্ষে তিন ঘণ্টার ড্রাইভ।

পরদিন অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি নিয়ে মায়ামির উদ্দেশে যাত্রা। এই ধরনের লং ড্রাইভে আমাদের প্রধান কাজ ফিউয়েল ইনডিকেটরে গাড়ির তেলের পরিমাণ দেখে নিয়ে ট্যাংক ভর্তি করে তেল নেয়া। গাড়ির চাকার হাওয়া পরীক্ষা করে প্রয়োজন হলে হাওয়া দেয়া। এক বোতল পানি বা কোক, এক প্যাকেট চিপস, এক কাপ কফি, দুই তিনটা মাথা ব্যথার টাইলেনল ট্যাবলেট। কারণ আই-৭৫ (I-75) হাইওয়েতে ৭৫ মাইলের মধ্যে কোনো গ্যাস ষ্ট্রেশন অর্থাৎ পেট্রল পাম্প, রেস্টুরেন্ট বা দোকানপাট কিছুই নেই। ৩০ মাইল পর পর হাইওয়ের পাশে অনেক বড় জায়গা নিয়ে রেস্ট এরিয়া বা রিকৃয়েশন এরিয়া আছে। এসব রেস্ট এরিয়াতে পরিচ্ছন্ন টয়লেট, ভেনডিং মেশিনে সফট ড্রিংকস থাকে। পার্কের মতো বসার জায়গা আছে। অনেকক্ষণ ড্রাইভ করে ক্লান্ত হয়ে গেলে এই এরিয়ায় নেমে হাটাহাটি করা বা বসা যায়।

আমাকে প্রথমে ধরতে হবে আই অর্থাৎ ইন্টারস্টেট-৭৫ হাইওয়ে সাউথ। তারপর ৫৯৫ ইস্ট, এরপর ৯৫ ওয়েস্ট। আমি সেলুলার ফোন ব্যবহার করি না। মায়ামি, টামপা, অরল্যান্ডো, ওয়েস্ট পামবিচ, ফ্লোরিডার রাজধানী টালাহাসি এসব দূরের সিটিতে যখন যাই তখন বন্ধুদের সেলুলার নিয়ে যাই।

মায়ামি এয়ারপোর্ট পেরিয়ে প্রায় ২০ মিনিট ড্রাইভ করার পর লিলিআপার বাসায় যখন পৌছালাম তখন দুপুর দুইটা। পরস্পর পরিচিত হলাম। কারণ আমরা কেউ কাউকে আগে দেখিনি। শিক্ষিত, মোটাসোটা ভদ্রমহিলা, সাবলীল কথাবার্তা। অল্পক্ষণের পরিচয়েই আমাকে আপন ভেবে অনেক ব্যক্তিগত কথা বললেন। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, কানাডার মন্টৃঅল-এ থাকেন। বনিবনা হয়নি বলে বিয়ের আঠারো বছর পর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মেয়েকে নিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। মেয়েটির নাম প্রতিতি। কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। শ্যামলা গায়ের রঙ। মিষ্টি চেহারা। বাসায় চা পর্ব শেষ করে মেয়েটি বললো, আধ ঘণ্টার জন্য তাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে।

তিনজনই এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি-কাম-সুভেনির থেকে তারা কিছু কেনাকাটা করলেন। আমি একটা টি-শার্ট কিনলাম ইউনিভার্সিটির ছাপ মারা। ঘণ্টা খানেক

ইউনিভার্সিটিতে ঘোরাফেরা করে এখন কি করা যায় প্রস্তাব উঠতেই বললাম, আমি খুবই ক্ষুধার্ত। আগে কিছু খাবো।

ইউনিভার্সিটির ক্যাফেটেরিয়াতে না খেয়ে কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম। নাম *টনি রোমাস।* গৃল ফুডের জন্য এই রেস্টুরেন্টের খুব নাম।

আমি নিলাম বিফ স্টেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও সালাড। তারা দুজন নিলেন মেরিনেটেড চিকেন, রাইস ও সালাড। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গেলাম পৃথিবী বিখ্যাত মায়ামি বিচে। এই বিচের কথা আরেকদিন হবে। সূর্যাস্ত দেখে ফিরে এলাম বাসায়। এবার আমার ফেরার পালা। রাতে ওনাদের সঙ্গে থেকে যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমাকে ফিরতেই হবে। আশি মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে ৯৫ ছেড়ে ওঠে এলাম ৫৯৫ হাইওয়েতে। একটু অন্য মনস্ক ছিলাম বলে ভুল করে ফেললাম। ৫৯৫ হাইওয়ে যেখানে এসে আই-৭৫ হাইওয়েতে বিভক্ত হয়েছে তারও চার পাচ মাইল আগেই রাস্তার দুই পাশে বড় বড় সাইনে ডাইরেকশন লেখা আছে।

I-75 North Naples.
I-75 South Miami.

অর্থাৎ আমি আসার সময় আই-৭৫ সাউথ ধরে এসেছি। এখন ৭৫ নর্থ ধরে ফিরতে হবে।

এখানে বলা প্রয়োজন, এসব হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর সময় সাবধানে রাস্তার ডাইরেকশনগুলো ফলো করতে হয় এবং চার পাচ মাইল আগেই লেন পরিবর্তন করে নির্দিষ্ট লেনে থাকতে হয়। ইন্টার সেকশনের কাছাকাছি এসে লেন পরিবর্তন করা যায় না। নির্ধারিত গতিসীমা ঘণ্টায় ৭০ মাইল হলেও কেউই আশি নব্বই মাইলের নিচে গাড়ি চালায় না। ডাইরেকশনগুলোতে স্পষ্ট করে লেখা আছে I-75 North Keep Left অর্থাৎ বাম দিকের লেনে থাকো। I-75 South Keep Right অর্থাৎ ডান দিকের লেনে থাকো। ইন্টার সেকশনের কাছাকাছি এসে দেখি, আমি সাউথ লেনে আছি। কিন্তু এখন কিছুই করার নেই। উঠে গেলাম ৭৫ সাউথে। অর্থাৎ আমি আবার মায়ামির দিকে যাচ্ছি। তবে সিটির কাছাকাছি হলে হাইওয়ে থেকে Exit নিয়ে বের হওয়া যায়। তাও প্রায় পনেরো বিশ মাইল ঘুরে এসে আবার কাঙ্ক্ষিত হাইওয়ে ধরা যায়। কমপক্ষে আধঘণ্টা সময় নষ্ট।

এক্সিট নিয়ে বের হয়ে ঘুরে এসে ধরলাম আই-৭৫ নর্থ। দশ মাইল পরই টোল প্লাজা। দেড় ডলার দিয়ে টোল অতিক্রম করে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলাম ৯০ মাইলে। ৭৫ মাইলের মধ্যে হাইওয়ের দুই দিকে কোনো শহর, বাড়ি-ঘর, মানুষজনের বসতি নেই তিনটি রেস্ট এরিয়া ছাড়া। আমি মাঝে মধ্যে গাড়ির ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে স্পিডোমিটারে দেখি গাড়ি কতো মাইল বেগে চলছে। সামনে কিংবা পেছনে লাল-নীল-হলুদ বাতি ফ্ল্যাশ করা গাড়ি অর্থাৎ পুলিশের গাড়ি দেখলেই সবাই ভদ্র হয়ে নির্ধারিত গতিসীমায় গাড়ি চালাই।

ইদানিং আরেকটি নতুন যন্ত্রণা হলো, এফ.বি.আই (Federal Bureau of Investigation) শতাধিক বিমান ও হেলিকপ্টার পালাক্রমে ২৪ ঘণ্টা সমগ্র আমেরিকার আকাশে উড়িয়ে দিয়ে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি নিয়ে ব্যস্ত। এসব বিমান ও হেলিকপ্টার থেকে সন্দেহজনক সব কিছু মনিটর করে, এমনকি জোরে গাড়ি চালালেও।

গাড়ি চলছে উল্কাবেগে। হঠাৎ দেখি গাড়ির ফিউয়েল ইন্ডিকেটর–এর হলুদ বাতি জ্বলে ওঠেছে। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। *খাইছে আমারে।* গাড়ির তেল শেষের পথে। আমার Honda Civic-LX 2000 মডেলের চার দরোজার সিডান গাড়িটি ৩০ মাইল রিজার্ভে চলে। কাপুনি দিয়ে জ্বর আসার মতো অবস্থা। এই রাতে নির্জন হাইওয়েতে কারো সাহায্য পাওয়া বুশ আর সাদ্দামের বন্ধুত্বের মতোই অসম্ভব ব্যাপার। একটা গাড়ি যখন আরেকটা গাড়িকে অতিক্রম করে তখন বাতাসের সঙ্গে গাড়ির ঘর্ষণের যে একটা শব্দ হয় সেটাই হাইওয়ের শব্দ। হু–উ–শ, হু–উ–শ।

এক বন্ধুর সেলুলার ফোন নিয়েছিলাম। উপায়ান্তর না দেখে আরেক বন্ধু সোহেলকে ফোন করলাম। আমাদের দুজনের কথা হলো নিম্নরূপ :

সোহেল, আমি তো এক বিরাট বিপদে পড়েছি দোস্ত।

কেন, কি হয়েছে? তোকে আবার পুলিশে ধরেছে?

আরে না। আমার গাড়ির তেল শেষ হয়ে যাচ্ছে।

গাড়িটা ইমারজেন্সি পার্ক করে তেলের ট্যাংক খুলে প্রস্রাব করে দে। বেশ কয়েক মাইল চলবে। আমি একবার দেশে মোটর সাইকেলের তেল শেষ হওয়াতে এই কাজ করে উপকার পেয়েছি।

কোনো ভালো বুদ্ধি কি দিতে পারিস?

পারি। গাড়িতে বিয়ার আছে?

না।

তাহলে রেস্ট এরিয়াতে পার্ক করে লম্বা টেবিলে হাত পা মুড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখ আর এফবিআই–এর বিমান ও হেলিকপ্টার গুণতে থাক। এ নিয়ে তুই একটা সুন্দর আর্টিকল লিখতে পারবি।

তোকে ফোন করাই আমার অন্যায় হয়েছে।

দোয়া দরুদ পড়া শুরু কর। আর আল্লাহ আল্লাহ কর।

তেল শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ আল্লাহ করলে যদি গাড়ি চলতো তাহলে প্রেসিডেন্ট বুশও আল্লাহ আল্লাহ করে বসে থাকতো। সাদ্দাম হোসেনকে মারার জন্য বিলিয়ন ডলার খরচ করে যুদ্ধ করতো না।

তুই এখন আই ৭৫–এর কোথায় আছিস?

আমি এভারগ্লেডস ক্রস করছি।

যেখানে এসে ফাইনাল ধরা খাস অর্থাৎ গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। আমাকে ফোন করে জানাস, আমি গ্যাস ক্যান–এ করে তোর জন্য তেল নিয়ে আসবো।

থ্যাংক ইউ ম্যান। তোর একটা মাত্র বন্ধু ফ্লোরিডায়। সব সময় বন্ধুর সেবা করবি।

আমি এবার ইংরেজি সিনেমার নায়কের মতো ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। মিনিটে গাড়ি যাচ্ছে দুই মাইল। জীবনে কখনো এমন মানসিক টেনশনে পড়িনি। তেল শেষ হয়ে গেলে নির্জন হাইওয়েতে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। আবার নির্ধারিত গতিসীমা ৭০ মাইলের স্থলে ১২০ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছি। পেট্রল পুলিশ ধরলে এবার ফাইন করবে না, নির্ঘাত ড্রাইভিং লাইসেন্স সাসপেন্ড

করবে আবারও। উপরে ভয় এফ.বি.আই-এর হেলিকপ্টারের। বর্তমান আমেরিকার অবস্থা খুবই খারাপ, সামান্য কারণে গৃনকার্ডধারীকেও ডিপোর্ট করে দেয়।

গাড়ির হেডলাইট হাই বিমে দিয়ে কেবল এক্সিট খুজছি। হঠাৎ দেখি, রোড সাইনবোর্ডে সবুজের মধ্যে শাদা লেখা মার্কো আইল্যান্ড-এক্সিট ১৫ (Marco Island-Exit 15) ৫ মাইলস। হাইওয়ের এসব এক্সিট সাইনে লেখা থাকে যে, এই এক্সিট দিয়ে বের হলে কি কি পাওয়া যাবে। এই সাইনেও লেখা আছে গ্যাস, তেল, ম্যাকডোনাল্ডস, হোটেল ইত্যাদি। আমার সিটি ফোর্ট মায়ার্স থেকে ৩৫ মাইল দূরে এই দ্বীপ।

এক্সিট দিয়ে হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যেই গাড়ির ফিউয়েল ইন্ডিকেটর লাল হয়ে বিপটোন বাজতে লাগলো। অর্থাৎ যে কোনো সময় গাড়ি থেমে যেতে পারে। তেল শেষ। গ্যাস স্টেশন থেকে প্রায় দুইশ গজ দূরে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল রাস্তার মাঝখানে। এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী গাড়ির ইমারজেন্সি লাইট জ্বালিয়ে দিলাম। রাস্তার সব গাড়ি স্লো হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ উপস্থিত। সংক্ষেপে তাদের বিস্তারিত বললাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে দুই গাড়িতে আসা চারজন শেরিফ অর্থাৎ পুলিশ বললো, তুমি গাড়িতে বসে স্টিয়ারিং ধরো, আমরা ধাক্কা দিয়ে তোমাকে গ্যাস স্টেশনে পৌছে দিই।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

গ্যাস স্টেশনে পৌছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতেই বললো, আমরা শুধু আইন-শৃঙ্খলাই রক্ষা করি না, যে কোনো মানুষের বিপদে সাহায্য করাও আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকে সেভাবেই ট্রেনিং দেয়া হয়।

শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, আরো অনেকের বেলায় একই ঘটনা ঘটেছে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে তাদের ইন্টারভিউ নিতে পারে।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও আমাদের ভাই, বন্ধু, আত্মীয়। আমাদের নেতানেত্রীরা প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণ করেন। তারা কি পারেন না সত্যিকারের জনগণের বন্ধু হিসেবে পুলিশ বাহিনীকে গড়ে তুলতে? পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরাও কি পারেন না আমাদের ভাই-বন্ধু হতে?

ফ্লোরিডা, আমেরিকা থেকে

অজানা

– মাহবুবুর রহমান ফারুক

মক্কায় অবস্থান কালে বিভিন্ন দেশি প্রবাসীদের জীবন পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাই। তার কয়েকটি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করলাম।

ব্যতিক্রমধর্মী ফেরিওয়ালাদের মাঝে আছে নিগ্রো এক মহিলা ও তার তিন চারটি শিশু নিয়ে এক দল। চুড়ি, ফিতা, মসলা, বিভিন্ন দানা ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে আজ এখানে, কাল ওখানে বসে। বাচ্চারা কেউ খেলছে, কেউ পায়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, কাউকে আবার তার মা পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কখনো তার কাছে অত্যন্ত মলিন অবস্থার খাদ্যদ্রব্যও থাকে। কে জানে এ খাদ্য কোথা থেকে

সংগ্রহ করা আর কেই বা এগুলোর গ্রাহক। করুণ দৃষ্টি দিয়ে পথচারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অত্যন্ত মলিন অবস্থা, করুণা হয় এদের দেখে।

ছোট হাতে সেলাই কল, খেলনা, কলম অথবা আতর নিয়ে এক বাঙালি যুবক ফেরিওয়ালা আমার পথরোধ করতো প্রায়ই। বেচারার কাছ থেকে কোনো দ্রব্য কেনার প্রয়োজন হয়নি। প্যালেস্টাইনি জনগণের সাহায্যের ছাপমারা প্রায় চার ফিট বড় একটি বক্স রাস্তার ধারের পিলারের সঙ্গে তালা–চাবি দিয়ে আটকানো। পাশে লাল চেক–এর তোয়ালে মাথায় মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে দাড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

দৃষ্টিনন্দন হৃদয়গ্রাহী যে ফেরিওয়ালা আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ ও আকর্ষণ করেছে সে হলো, ইয়েমেনি মুচি এবং সম্ভবত তার নাতি। অবশ্য তাকে সামান্যতম সাহায্য করার সুযোগ আমাদের হয়নি। কিন্তু প্রতিবার যাওয়া–আসার পথে তাদের কার্যবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তার ও তার নাতির আচরণ, পোশাক, চেহারা এবং সর্বোপরি তাদের ভাবভঙ্গি এমনই মুগ্ধকর ছিল যে, তাদেরকে মুচি বলতে হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হয়, সংকোচ লাগে, অপরাধী মনে হয়। হায়! হিংসা ও স্বার্থ মানুষকে কিভাবে, কোথায় স্থান দেয়। জানি না নিজ দেশে সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ কি না, কোনো চক্রান্ত তার আভিজাত্য ও সম্পদ হরণ করেছে কি না। তবে সে যে ইয়েমেনের এ তথ্যটা জেনেছিলাম আমার হোটেলবয় বেলালের কাছে।

বুড়োর বিরাট পাগড়ি ও কারুকাজ করা জোব্বা, সালোয়ার, কামিজ, ওয়েস্টকোটসহ নিখুত পোশাক যা যে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য মানানসই। দীপ্ত চোখ, সত্তরোর্ধ গোল মুখ, খোচা খোচা দাড়ি। কপাল, গালে হাজারটা ভাজ। তাই বলে লাবণ্যের কমতি নেই। পাগড়ির ফাকে কাচা–পাকা চুলসহ সুন্দর একটি নিখুত গোল টাক। হাত ও পায়ের অনাবৃত অংশের লোমও কাচা–পাকায় মেশানো। যাওয়া–আসার পথে বহুবার তাকে দেখেছি নিবিষ্ট মনে জুতা মেরামত করে চলেছে। সামনে সুন্দর করে সাজানো লোহার অ্যাঙ্গল, ছোট ছোট কৌটায় বিভিন্ন সাইজের পেরেক, সুতা, রঙয়ের কৌটা, ব্রাশ, চিমটে, ভ্রমর, ফিতাসহ হাজারো প্রয়োজনীয় দ্রব্য। কোনো বিশৃঙ্খলা নেই তার সাজানোতে, নেই তার কোনো কাজেই।

ওই ব্যক্তি থেকেও সুন্দর তার পাচ ছয় বছরের নাতি। নানার হুবহু ছোট সংস্করণ, এমনকি পোশাকেও শুধু পাগড়ি ছাড়া। কখনো দূরে যায় না, পাশে বসে খেলছে অথবা নানার ঘাড়ের দুধারে দুহাত ঝুলিয়ে মাথার ওপর মাথা রেখে দোল খাচ্ছে অথবা মুখোমুখি বসে রুটি মুখে পুরছে। হায় উদ্বাস্তু জীবন, কতো বেদনাদায়ক!

এ পথেই এক বাঙালি যুবকের ফলের দোকান। ফুটপাথের পাশে প্রায় পাচ ফিট উচুতে। যাওয়া বা আসার পথে প্রতিবার ডাকবেই। মিষ্টি হেসে আঙুর বা আপেল কেনার জন্য প্রলুব্ধ করবে। সউদি মালিকের কর্মচারী সে। দামে সচেতন, হিসাবে নিখুত। এ দোকানের পাশের গলিতেই আছে অনেকগুলো দোকান। কার্পেট, ব্যাগ, খেলনা, গয়না, হাজারো পসরা।

যে ব্যাগ দেশ থেকে এনেছিলাম তাতে ক্রয়ের তালিকা বিশাল হওয়ায় নতুন ব্যাগের সন্ধানে এ গলিতে প্রবেশ করলাম। এটি প্রকৃত অর্থে গলি নয়, বিশাল আয়তনের হোটেল *শুভ্রা*–র নিচের তলা ও সংলগ্ন স্থান। ছোট ছোট গলি বানিয়ে পাশাপাশি অনেক দোকান করে দিয়েছে। গলির শেষ মাথায়

রাস্তা দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে গেছে। এ পর্যন্ত আসতেই চোখে পড়লো দুই পাশে দুটি প্রত্যাশিত দোকান।

ডান পাশের দোকানে মলিন চেহারার এক অতিবৃদ্ধের করুণ চাহনি দেখে দয়া হলো। একটু এগোতেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সালাম জানিয়ে ভেতরে যেতে আহবান করলো। মুগ্ধ হলাম তার আচরণে। ছোট দোকান পনেরো ফিট প্রস্থ এবং আঠারো ফিট দৈর্ঘ হবে। ব্যাগ ও কার্পেটে ঠাসা। একটি ব্যাগের দিকে ইশারা করতেই ওই ধরনের অনেকগুলো এনে হাজির করে। অতিরিক্ত কথা নেই শুধু দাম বলে আর বলে *উমদা*।

শেষে একটা ব্যাগ পছন্দ হয়েছে বলাতে তা সম্পূর্ণ খুলে ভেতর বাইরে চেক করে দেখিয়ে দিল কোথাও ক্রটি আছে কি না। দামাদামি নেই। পঁচিশ রিয়াল দিয়ে ব্যাগ হাতে ঝোলালাম। স্মিত হেসে এবার বুড়ো বলে, হিন্দুস্থানি?

নিজের দিকে আঙুল দিয়ে বলে, আফগান জং।

জবাবে বাংলাদেশি এবং শোকরিয়া, শোকরিয়া বলে বিদায় নিলাম।

তার হৃদয়ের ব্যথা আর শোনা হলো না। আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে সব হারিয়ে বেচারা উদ্বাস্তু হয়ে ঠাই নিয়েছে এ দেশে। কবে ফিরে যেতে পারবে, আদৌ পারবে কি না? ছেলেমেয়ে কে কোথায়, আদৌ বেচে আছে কি না, বাড়ি–ঘর আছে কি না কে জানে? সব হারিয়ে পড়ে আছে একদিন দেশে ফিরে যাবার প্রত্যাশায়।

ব্যাগ নিয়ে ফিরছি। ভাই, সালামআলাইকুম, কেমন আছেন?

একদম ঢাকাইয়া উচ্চারণ শুনে কাছে এগিয়ে গেলাম। শুরু হলো ঢাকাইয়া স্টাইলে কুশল বিনিময় পর্ব। সংকোচ ও জড়তা নেই। এ সময়ে ক্রেতার চাপ বেশি না থাকায় কাছের চার পাচটি দোকানের দশ বারোজন দোকানি ঘিরে ধরলো। কেমন আছি, দেশের অবস্থা কেমন, জহুরুল ইসলাম ও সালমান এফ রহমানের কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ দেশের কতো ক্ষতি করেছে ইত্যাদি কথায় পরিবেশটা ভিন্ন আকার ধারণ করলো।

আমাদের সময় বেশি থাকলে হয়তো ওদের প্রশ্নের কিছুটা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারতাম। হাজারটা প্রশ্নের একটি বা দুটি উত্তর ওদের কতোটুকু তৃপ্তি দিতে পারলো কে জানে! হঠাৎ দৃষ্টি গেল বিশ বাইশ বছর এক যুবকের দিকে। ছলছল চোখে বোকার মতো তাকিয়ে আছে। কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো কিছু জানার আগ্রহও নেই, আছে অব্যক্ত দুঃখ আর চাপা অভিযোগের অভিব্যক্তি। ইশারা করে কাছে আসতে বললাম।

কেমন আছো? কবে এসেছো? সব ভালো তো?

প্রশ্ন শেষ করার আগেই তার আবেগ আর বাধ মানতে চায় না। অশ্রুসিক্ত চোখে শুধু বলে, পড়ালেখা হলো না, জীবন শেষ, দেশে ফেরা হলো না...।

তাকে থামিয়ে তার গ্রাম সুবাদে ভাই বললো, বিএ পরীক্ষা দেবে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে, এ সময়ে রাজনৈতিক গোলযোগে এক ছাত্র খুন হয়। গ্রাম্য শত্রুতার জের হিসেবে হুলিয়া বের হয় এর নামে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে চলে আসে এ দেশে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার পিছু ছাড়েনি। এ

দেশের আসার পর টের পায় পাসপোর্টটি ছিল ভুয়া। তাই পুলিশের ভয় এখানেও রয়ে গেছে। দেশে গেলে মৃত্যুদণ্ড, এ দেশে থাকলে জেল। যতোদিন সম্ভব আমি আশ্রয় দেবো। কিন্তু তারপর?
হ্যা, তার আর পর নেই। ভাগ্য মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না।

গাজীপুর থেকে

বঞ্চিত

– ফারুক

ডি-থ্ (D-3) ভিসায় কোরিয়া এসেছি। ডি থ্-এর মানে ডার্টি, ডেঞ্জারাস ও ডিফিকাল্ট। যে কাজে এসে পড়লাম তাতে ডি-থ্ নামটা উপযুক্তই বলতে হবে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ, তার ওপর ওভারটাইম করা ছিল বাধ্যতামূলক। থাকার বাসাটা ছিল আরো খারাপ। পরিত্যক্ত একটা খামারবাড়ি। আমরা ছিলাম চারজন। এ বাসাতে থাকাতে পোকা-মাকড় ও ইদুরের যে খুব অসুবিধা হয়েছিল সেটা দুদিন পরেই বুঝতে পারলাম। তবুও যতোটা সম্ভব ওদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চেষ্টা করলাম। ঘরের পুরনো আসবাবপত্র ও বিছানা সব আমাদের ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন ম্যানেজার। বললেন, এখানে বেশি দিন থাকতে হবে না, ছয় সাত মাস পর আমাদের কম্পানি শহুরে শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করা হবে। সেখানে তোমাদের সব নতুন কিনে দেবো। এখন এসব দিয়েই চালাও।

ঘরটা ছিল খুবই পুরনো। চারদিকে খুটি দিয়ে ঠেস দেয়া। ঘুমালে মনে হতো, না জানি কখন ধসে পড়ে। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখলাম বৃষ্টি হলেই রান্নাঘরে হাটু পরিমাণ পানি জমে যায়। আরো সমস্যায় পড়লাম – বৃষ্টি হলেই পোকা-মাকড়, ইদুর-ব্যাঙের দৌড়-ঝাপ বেড়ে যায়। কোনো পক্ষই শান্তিতে ঘুমাতে পারি না। ম্যানেজারকে সব বললাম। আমার কথায় ম্যানেজার খুব হাসলেন। বেশ কিছুদিন পর আমাদের ভাড়া করা বাসায় আনলেন। নতুন বাসা ভালোই লাগলো। কিন্তু বিছানাগুলো যে সেই দাদা-পরদাদার আমলের। এর মধ্যেই কাজের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক বন্ধু পালিয়ে গেল। পরদিন ম্যানেজার তিনজনের ওপর অনেক হম্বি-তম্বি করলেন। ভয় পেলাম না।

বাসার কাছেই ছিল ফ্যাক্টরি। চারদিকে ধানক্ষেত। আশপাশে মুরগি-গরুর খামার, আঙ্গুর বাগান। ধানক্ষেত দেখলেই গ্রামের কথা খুব মনে পড়তো। এদেশে ধান প্রচুর হয়। শীতপ্রধান দেশ। তাই বছরে একবার ফলন হয়। কৃষি কাজে সব আধুনিক পদ্ধতি। মেশিনে ধান বোনে, মেশিনেই ধান কাটে।

প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে শরীরের নানান জায়গায় ব্যথা হতে লাগলো। ভারী জিনিসপত্র টানাটানি করার ফলে কোমরে চাপ পড়তে লাগলো। কোমর ব্যথায় প্রায়ই কাহিল হয়ে যাই। মাস শেষে বেতনের পরিমাণ দেখে কষ্ট আরো বেড়ে যায়। এতো পরিশ্রম আর এই সামান্য বেতন! ম্যানেজার বলতেন, বেশি বেশি ওভারটাইম করবি, বেতন বেশি পাবি। তার কথা শুনে জেদ চেপে যেতো। কিন্তু কিছুই করার নেই। যে চুক্তিতে এসেছি তার বেশি দেবে কেন?

ভাবতে লাগলাম, এখানে বেশি দিন থাকা যাবে না। আসার আগে এজেন্সিতে জামানত হিসেবে দলিল জমা দিতে হয়েছে। আমার পক্ষে শ্বশুর তার পুরনো বাড়ির কিছু অংশের দলিল জমা

দিয়েছেন। যতোদিন দলিল না তোলা যায় ততোদিন পলানো যাবে না। সব কিছু জানিয়ে দেশে চিঠি দিলাম। জবাব এলো, পালানোর আগে দলিল না তুলতে পারলে পরে বড় ধরনের ঝামেলা হতে পারে।

যতো কষ্টই হোক, পালাতে চাইলেও পালাতে পারলাম না।

নতুন জায়গায় কম্পানি স্থানান্তর হলো। পরিশ্রম আগের চেয়ে বেড়ে গেল কয়েকগুণ। থাকার জায়গা, গোসলখানা, টয়লেট সব কিছু পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। শুধু বিছানাগুলো পরিবর্তন করা গেল না। আসলে ম্যানেজার ভেবেছিলেন এতো কষ্টের কাজে আমরা টিকতে পারবো না, পালিয়ে যাবো। তাই বিছানাপত্র কিনে কি লাভ। অনেক চেষ্টার পরে ম্যানেজার নতুন বিছানাপত্র কিনে দিতে বাধ্য হন।

কম্পানির কাজ বাড়লো। কিন্তু শরীরের জোর কমতে লাগলো। ওষুধ খেলে যতোটা সুস্থ হই, পরিশ্রমের ফলে তারচেয়ে বেশি ভেঙে পড়ি। আর এ দেশে ওষুধও এক সঙ্গে আট দশটি করে খেতে হয়। আমার অসুস্থতা ম্যানেজার ভালো চোখে দেখলেন না। প্রথম প্রথম হাসপাতাল, ক্লিনিকে নিয়ে যেতো। পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অফিসে বসে থাকলেও জিজ্ঞাসা করে না কেমন আছি। ভাবখানা এ রকম যে, তোর শরীরে জোর নেই, তোকে দরকার নেই। দরকার নেই সেটা আমিও বুঝি। তবে দলিল যে তোলা হয়নি। তিন মাসে যা বেতন পেলাম তা এক মাসে হাসপাতালে দিলাম। অফিস থেকে টাকা দেবে না। তারা বলে এটা নাকি আমার পার্সনাল অসুখ। অথচ ভারী কাজ করতে গিয়েই আমার এই অবস্থা।

ধীরে ধীরে অবস্থা আরো খারাপ হলো। বাড়ি থেকে জানালো, দলিল আনা হয়েছে তুমি পালাও।

বললাম,পালিয়ে কই যাবো, আমি যে শেষ।

কম্পানির মেডিকাল কার্ডে অল্প পয়সায় চিকিৎসা এবং থাকা–খাওয়ার নিশ্চয়তা তো আছে। সুতরাং শুয়ে শুয়ে আর ওষুধ খেয়ে দিন যেতে লাগলো। পরের মাসে ন্যূনতম বেতন পেলাম। এমনকি বন্ধের দিনের বেতনও দিল না। জেদ চেপে গেল। ব্যাগ নিয়ে বন্ধুর বাসায় উঠলাম। এই বিপদে বন্ধুদের সাহায্যের কথা কখনো ভুলবো না।

ওরা আমার জন্য অনেক করেছে। এখানে বিশ্রামসহ চিকিৎসা চললো। কিছুটা সুস্থ বোধ করলাম। দুই মাস পর হালকা কাজ দেখে এক জায়গায় চলে গেলাম। বন্ধুদের বললাম, তোমাদের এখানে যদি লোক নেয় তবে জানাবে। বন্ধুদের একজনের নাম সোহেল, বাড়ি নরসিংদী। অপরজন মানিক, বাড়ি ফেনী।

ছয় সাত মাস পর ওদের কাছে চলে এলাম। এখানে কাজ হালকা, বেতনও মোটামুটি ভালো অন্তত আমার জন্য।

বছর খানেক ভালোই ছিলাম। পুরনো ব্যথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। আবার পরীক্ষা–নিরীক্ষা চললো। ডাক্তার বললেন, তোমার বিশ্রাম দরকার। কোমরের অবস্থা ভালো না। বিশ্রাম প্লাস আমাদের এখানে ফিজিও থেরাপি নিতে হবে।

বললাম, আমি এ দেশে এসেছি কাজ করার জন্য। কাজ করলে পয়সা, না করলেই নয়। তাছাড়া আমি বিশ্রাম নিতে চাইলে কম্পানি রাখবে না। তুমি আমার ব্যথা কমার ওষুধ দাও এবং আমি যতোটা পারি ফিজিও থেরাপি ঘরেই করে নেবো।

ডাক্তার সব শুনে বললেন, তবে ভারী কিছু তোলার সময় সাবধান থেকো।

ইচ্ছে করে দেশে চলে যাই। আবার ভাবি, কি হবে দেশে গিয়ে। এ দেশে আমি একজন দক্ষ শ্রমিক আর দেশে গেলেই বেকার। এবং এ দেশে আসাটা আমাদের জন্য স্বপ্নের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট। তার উপর হিংসার রাজনীতি দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। বিরোধী দল সরকারের বিপক্ষে কথা বলতে বলতে এখন দেশের বিরুদ্ধেই কথা বলছে যেন বিরোধী দল তাকে তো বিরোধী কথাই বলতে হবে। আমেরিকা এখন তো আমাদের দেশকে কালো তালিকায় রেখেছে। এভাবে দেশ চলতে থাকলে শেষে এক সময় দেখা যাবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশও আমাদেরকে কালো তালিকায় রাখছে।

এ দেশে আমাদের কাজের সুনাম আছে। বাংলাদেশিরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। আমরা প্রবাসীরা দেশকে সামনে নিতে চাইলে কি হবে, দেশের নেতারা দেশকে পেছনে টানছেন। প্রতি সপ্তাহে অপেক্ষা করি কখন যাযাদি হাতে পাবো। দেশে হরতালের কারণে সেটাও আসতে দেরি হয়ে যায়। সুন্দর এবং সুষ্ঠু রাজনীতি যদি থাকতো তবে আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে যেতো। এক দলের কথা অন্য দলের সহ্য হয় না। আমরা যতোটা দেশের জন্য ভাবি, দেশের নেতারা ততোটা ভাবেন কি না সন্দেহ। হয়তো ভাবেন যে, কিভাবে পেছনে নেয়া যায়।

কতোদিন এ দেশে থাকতে পারবো জানি না। মেয়েটার কথা ভাবলে খুব কষ্ট হয়। স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বললে মেয়েটা লাইন কেটে দেয়।

আমি বলি : লাইন কাটো কেন আব্বু?

তাহলে তুমি আসো না কেন?

পরে আসবো।

তুমি কালকে আসো।

আমার এক মাত্র মেয়ে, ওর কথা শুনে চোখে পানি আসে। মাঝে মধ্যে রাগ করে কথাই বলে না। মন ভালো থাকলে অনেক কথা বলে, অনেক আবদার তার। আমি এলে কোথায় কোথায় যাবে, কি করবে সব বলে। ওর মা বলে, সারা দিন নাকি কাবুলিওয়ালার মিনির মতো কথা বলে।

টাকার জন্য আমি প্রবাসী আর আমার মেয়েটা তার বাবার আদর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিদিন। জানি না এ লেখা ছাপা হবে কি না। ছাপা হলে হয়তো কিছুটা ভালো লাগবে। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো ভুলে থাকতে পারবো সব কিছু।

কোরিয়া থেকে

উচাটন মন

– তৌফিক

একটা দেশ, কিই বা আছে। সমস্যায় জর্জরিত, জনপদ ভারে ন্যুব্জ, আবহাওয়ায় দূষিত, অনিয়ম–দুর্নীতিতে অভ্যস্ত।

খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যে কি না একবারও দেশের গুষ্টি উদ্ধার করেনি। এটা একটা দেশ হলো! শালার দেশ ছেড়ে যেতে পারলে বাচি বলে মাতম যারা করে আমিও আছি সে দলে। ধোয়া তুলসী পাতা নই।

১৯৯৮ সালের ৩০ মে জীবনে প্রথম দেশ ছাড়লাম। তাও আনন্দের যাত্রা। স্বল্পকালে বিদেশ ভ্রমণ, পাশে আমার আরাধ্য নারী, আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী। স্বপ্নতুল্য দেশ আমেরিকার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ হলেও সেই যাত্রায় জীবনে কখনো বিদেশে না যাওয়া এই আমি এবং আমার প্রচুর দেশ ভ্রমণকারিণী স্ত্রীসহ বহু ঘুরলাম।

সিঙ্গাপুরের সেনটোসা, আমেরিকায় লস এঞ্জেলেসের ইউনিভার্সাল স্টুডিও, ডিজনিল্যান্ড, কানাডা–আমেরিকা মধ্যস্থ চোখ থেকে পানি বের করানো সৌন্দের্যের অধিকারী নায়াগ্রা ফল। কোনো কিছুই ভোলাতে পারেনি এই পোড়ামুখী দেশটার কথা।

অকল্পনীয় সিসটেমেটিক, অভাবনীয় উন্নতি, অসাধারণ টেকনলজি, সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েও বার বার মনে হয়েছে, দেশে না খেয়ে থাকলেও ভালো। আমেরিকাতে থেকে যাবার জন্য অনেকের উপদেশ উপেক্ষা করে যেদিন দেশে ফিরলাম সেদিন মনে হলো, নিজেকে ফিরে পেলাম। কি যে শান্তি এই পোড়ার দেশে।

২০০১ সালের মাঝামাঝি সময়কার কথা। বিসিএস পাস করে প্রথম কর্মস্থল গাজীপুরের কাপাসিয়া টোক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকাল অফিসার হিসেবে চাকরিতে থাকা অবস্থায়, একদিকে যেমন স্বাস্থ্য সেবাদানের অপ্রতুলতা, অন্যদিকে সার্বক্ষণিক থাকতে না পারার গ্লানি সব মিলিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আবার দেশ উদ্ধারে লেগে যাই। এ দেশে থেকে কি হবে!

এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে জাপানের ইয়ামাগাতা ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকাল স্কুলে পিএইচডি করতে জাপান সরকারের মনবশু বৃত্তি পেয়ে জাপান চলে আসি ২০০২ সালের ১ অক্টোবর। এখানকার যন্ত্রমানবদের প্রায় সার্বক্ষণিক সাহচর্যে থেকেও নিজেকে যান্ত্রিক জানাতে না পেরে তিন মাসের মাথায় বড় দিন, নববর্ষ ইত্যাদির ছুটিতে প্রফেসরকে কোনো মতে রাজি করিয়ে চলে যাই দেশে।

প্রথম দিকে মনে হতো পরিবার–পরিজন, বন্ধু–বান্ধব এদের জন্যই বুঝি এতো খারাপ লাগে। কিন্তু না, যখন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস অফ ইয়ামাগাতা (AIRY)-তে গিয়ে অনেক খুজেও অন্য অনেক দেশের পতাকার মাঝে বাংলাদেশের পতাকা না পেয়ে অনুষ্ঠান বর্জন করে রাগে–ক্ষোভে তখন কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে আসি। বাংলাদেশ সম্পর্কিত নেগেটিভ যে কোনো বক্তব্যকে সহজাতভাবেই কোনো না কোনো খোড়া যুক্তিতে কাটানোর চেষ্টা করি। তখন বুঝি এই জীর্ণ–শীর্ণ–দুঃখী দেশটাও জানে ভালোবাসার প্রগাঢ় বন্ধনে জড়াতে।

ইয়ামাগাতা গিয়ে এই দফায় যে কয়দিন দেশে ছিলাম তার মধ্যে অসম্ভব ভালোগালা সময়গুলো ছাপিয়ে যে দুটো ঘটনা তাড়াতাড়ি ইয়ামাগাতে ফিরে আসার জন্য তাড়া করছিল তা হলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ সান্ধ্যকালে দুই অপরিচিত যুবক প্রথমে আলাপচারিতার পর ছিনতাইকারী রূপে আত্মপ্রকাশ।

অপরটি আরো কষ্টদায়ক। ব্যাংকে কর্মরত ক্যাশিয়ার বাবার বয়সী ব্যক্তির কাছে আমার স্ত্রীর তার নিজের একাউন্ট থেকে টাকা তোলার সময় পাচশ টাকার নোটের পরিবর্তে দ্বিতীয়বার একশ টাকার নোট চাওয়ার অপরাধে উক্ত ভদ্রলোক (?)–এর অকল্পনীয় বিশ্রী ব্যবহার।

ইয়ামাগাতায় ফিরে এসে মন দিয়ে কাজ করছি। প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হচ্ছে। আবার যেই কি সেই। যে কোনো তরল গড়ালে নিচের দিকেই যায়। প্রফেসর বললেন পিএইচডি কোর্সের ফর্মালিটিজগুলো শেষ করে ফেলতে। চিন্তা করার দুই দিনের সময় নিয়ে বিনীতভাবে জানলাম আরো চার বছর প্রবাসী জীবন কাটানো সম্ভব নয়। দেশে ফিরতে চাই। পিএইচডির দরকার নেই, এক বছরের বিনিময়ে ডিপ্লোমাতেই খুশি।

বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবাইকে দেখেছি দেশের জন্য কেমন উতলা থাকে। দেশেই অবস্থান করতে পারাটাকে সৌভাগ্য মনে করে এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশে ফিরে যাবার স্বপ্ন নিয়ে প্রবাসে দিনাতিপাত করে।

বিদেশে অবস্থানকালে সময়গুলো আমার কাছে জীবন্মৃত বোধ এনে দেয়। এতো কিছুর পরও জানি দেশে ফিরে আবার হয়তো মনে হবে, না ফিরলেই ভালো হতো।

আচ্ছা, সবাই মিলে দেশটাকে আরেকটু বাসযোগ্য করা যায় না!

ইয়ামাগাতা, জাপান থেকে

আফৃদি ক্রেজ

– ঈষিতা ইয়াসমিন

তখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। একবার সুযোগ এসেছিল পাকিস্তানে যাওয়ার। সেখানে আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। প্রথম প্রথম খুবই আনমনা থাকতাম। কারণ কারো সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ একদিন খুবই সুন্দরী স্পষ্টভাষী একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয়। সবাই তাকে ক্ষ্যাপাতো মিসেস আফৃদি বলে। কারণ সে ছিল আফৃদির প্রচণ্ড ভক্ত। সারাক্ষণ তার মুখে ছিল আফৃদির প্রশংসা।

আমি এমন অনেক কৃকেট ফ্যানকে দেখেছি যেমন রাহুল দ্রাবিড় ও সৌরভ গাঙ্গুলির ভক্ত, যাদের দুই একজন খুবই কাছের মানুষ। কিন্তু এমন ক্রেজি ফ্যান একটিও দেখিনি। এমনকি নিজের হাতে আফৃদির নাম লিখতেও কার্পণ্য করে না।

মেয়েটির সঙ্গে হয়তো আফৃদির কখনো বিয়ে হবে না। অন্যের হাত ধরে সে হয়তো চলে যাবে অন্যের ঘরনী হয়ে। কি হবে এই উন্মাদনার পরিণতি?

মেডিকাল স্টাফ কোয়ার্টার, চট্টগ্রাম থেকে

ভোগ্য

– শিকদার মোহাম্মদ নূরুল মোমেন

তহুরার বাহরেইন যাওয়ার কথা শুনে অবাক হই, তার চোদ্দ বছরের মেয়ে বিদেশ গিয়ে কি কাজ করবে?

তাহুরার মা বিধবা মজিরুনের সঙ্গে আলাপে জানতে পারি, ছেলেকে পাঠাতে হলে লাখের ওপর টাকা লাগে। কিন্তু মেয়েকে পয়তাল্লিশ হাজার টাকায় পাঠানো সম্ভব হয়েছে। এই টাকা জোগাড় করতেও তার বসত–ভিটে বন্ধক রাখতে হয়েছে। তহুরাকে অচেনা দালালের মাধ্যমে বাহরেইন পাঠানোর কথা শুনে শংকিত হই। কিন্তু তা ওর মাকে বুঝতে দিই না।

পরবর্তীকালে তহুরার মায়ের সঙ্গে দেখা হলেই মেয়ের খোজখবর জিজ্ঞাসা করতাম। এক রাতে তহুরার মায়ের আনন্দে উদ্বেলিত কণ্ঠ শুনি, ভাইজান, আপনেগো ভাতিজি চিঠি দিছে। লম্বা খামটা আমার হাতে দিয়ে বলে, *মজিবরের দিয়া পড়াইছি, ও ভালোভাবে সব পড়বার পারে নাই। আপনে আবার একটু পইড়া শুনান।*

চিঠিতে ভুল বানান ও ভুল বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের ছড়াছড়ি, হাতের লেখাও যা তা। মাকে লেখা চিঠিতে ভালোভাবে পৌছানোর কথা জানিয়েছে, আরো অনেক কথার সঙ্গে তাহুরা ওর ছাগলটির খবরও জানতে চেয়েছে। মেয়ের চিঠি পড়া শুনতে শুনতে তহুরার মায়ের চোখে নীরব অশ্রুজল বয়ে যায়। চিঠির উত্তরও লিখে দিই।

প্রায় দেড় মাস পরে তাহুরার দ্বিতীয় চিঠিটি আসে। ওতে লিখেছে, ওখানে ওর একদম ভালোলাগে না। বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে, ওখানে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। বেতন পেলেই তা দেশে পাঠানোর আশ্বাস দেয়।

এ দেশে মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়ানো কিশোরীটির পরবাসী জীবনের নিঃসঙ্গতা আচ করি। নানান সান্ত্বনামূলক কথা দিয়ে ওর চিঠিটির উত্তর লিখি।

অনেক দিন তহুরার চিঠি আসে না।

অবশেষে পুরো পাচ মাস পরে তহুরার চিঠি আসে। চিঠিটি পড়াতে মজিরুন আবারও আমার কাছে ছুটে আসে। খাম খুলে চিঠি ও পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা ড্রাফট পাই। চিঠিটি পড়ে শংকিত হয়ে পরি, তহুরার মাকে এ ব্যাপারে কিছু বলি না। তহুরাকে বিস্তারিত লিখে জানাতে বলি। মজিরুনের অনুরোধে দুই তিনবার মেয়ের চিঠিটি পড়ে শোনাতে হয়।

এক মাস অপেক্ষার পর তহুরার চিঠি পাই। চিঠিটি দ্রুত পড়ি, আমার ধারণা, ভাবনা পুরোপুরি মিলে যায়। শুদ্ধ রীতিতে চিঠিটির সংক্ষেপ রূপ :

মা, টাকা রোজগার করা অনেক কষ্ট। এতো দূরের দেশেও শান্তি নাই। সারা দিন মালিকের পঙ্গু বৌকে দেখাশোনা করি, রাতে শান্তির ঘুমটুকুও ঘুমাতে পারি না। প্রায় রাতেই মালিক ও তার দুই তিনজন বন্ধু মিলে আমার ওপর দৈহিক নির্যাতন চালায়। মা, আমি এমন নির্যাতন সইতে পারছি না। দেশের কাউকে চিনিও না যে সাহায্য চাইবো। ওদের খুন করতে ইচ্ছে করে। কখনো কখনো নিজের গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এ দেশে টাকা রোজগার করতে এসেছি বলেই কোনোটাই করতে পারি না। আমরা গরিব। আমাদের মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করতে হয়। মা, এগুলো কেউ যেন না জানে। তাহলে গ্রামে মানুষকে মুখ দেখাতে পারবে না।

এ চিঠিটির কিছুই গোপন করি না। তহুরার মা সব শুনে নিথর হয়ে যায়। পরবর্তীকালে জেনেছি, তহুরার মা ওই দালালের কোনো খোজ পায়নি।

তারপর আর কোনোদিন তহুরার মা আমার কাছে কোনো চিঠি নিয়ে আসেনি। তহুরার ঠিকানায় আমাদের গ্রামের প্রবাসীরা যোগাযোগ করেও তার কোনো সন্ধান পায়নি। আমরা কেউ জানি না দূরদেশে নিষ্ঠুর পাশবিকতার শিকার মেয়েটির অবস্থা। মেয়ের পথ চেয়ে আছে তিন বছর যাবৎ মেয়ে হারানো মা। তাকে কোনো সান্ত্বনাও দিতে পারিনি।

এ দরিদ্র দেশের অনেক অসহায়, অজ্ঞ নারী বিদেশ গিয়ে ভোগ্যদ্রব্য, পণ্য হচ্ছে। ওদের কেউ তহুরার মতো তা মেনে নিতে পারছে না। আবার কেউ দারিদ্র ঘোচাতে সব মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছে।

আজকের প্রচণ্ড কষ্ট বোধ যেন ভবিষ্যতে প্রবাসীদের কষ্ট রোধে ভূমিকা রাখতে পারে, এমন প্রত্যাশাই করি।

জয়মন্টপ, মানিকগঞ্জ থেকে

স্বামীর কাছে যাবো

– রাহেনা বেগম

২০০২ সালে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামী ইংল্যান্ড থাকেন। তিনি সম্পর্কে আমার চাচাতো ভাই হন। আমার বিয়ে এপৃলের ২১ তারিখ হয়েছিল।

আমার স্বামীকে মজা করে বলেছিলাম, তুমি যদি ইংল্যান্ড না থেকে বাংলাদেশে থাকতে তবে তোমার কনে পাওয়াটা খুব সমস্যা হতো।

তিনি তখন হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন?

তখন বলেছিলাম, তুমি তো খাটো, সে জন্য।...আমি লম্বা মেয়ে, আমার পাশে দাড়ালে তাকে পনেরো ষোল বছরের ছেলে মনে হয়।

আসলে লন্ডন–আমেরিকায় যেসব প্রবাসী বাঙালিদের সন্তান হয় তারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেসব দেশে তারা যেমনই থাকে না কেন, বাংলাদেশে যখন আসে তখন তাদেরকে অবশ্যই অন্য রকম দেখায়। কারণ বাংলাদেশে আত্মীয়স্বজনদের ভালোবাসার উত্তাপ ওরা ভালোভাবেই অনুভব করতে পারে।

যখন প্রবাস থেকে বাংলাদেশে কোনো বিয়েযোগ্য ছেলে বা মেয়ে আসে তখন সে বাড়িতে উকিল ও আত্মীয়স্বজনদের ভিড় লেগে যায়। অনেকেই সে পাত্র–পাত্রীর বা তাদের গার্ডিয়ানদের নেক নজরে পড়ার জন্য অনেক রকম পাগলামিও করে ফেলে।

আমার বিয়ের রাত থেকে আমি জানি আমার স্বামীকে এ দেশে বেশি দিন পাবো না। মাস তিনেক থাকবেন। তারপর ইংল্যান্ড চলে যাবেন। ওখানে গিয়ে আমার জন্য কাগজপত্র তৈরি করবেন।

আমার স্বামী চশমা ছেড়ে কন্টাক্ট লেন্স পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুম সেরে এসে লেন্স পরিষ্কার করে চোখে দেয়ার আগ পর্যন্ত তাকে অন্য রকম লাগে। তিনি লেন্স পরার পর চমৎকার হাসি দেন। তার কাছ থেকে শিখেছি কিভাবে লেন্স পরাতে হয়। মাঝে মধ্যে তার চোখে লেন্স পরিয়ে দিয়েছি। সুখের দিনগুলো যেন মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

জুলাই মাসের ১০ তারিখ তার ফ্লাইট, ওসমানী এয়ারপোর্টে যখন তাকে বিদায় জানতে গেলাম, বিদায়ের মুহূর্তে আমার দুচোখ ফেটে পানি বের হলো।

তখনই বুঝলাম, যে কোনো বিদায়ই খুব কষ্টের। ইংল্যান্ড যাবার পর থেকে সপ্তাহের প্রতি রবিবার তিনি টেলিফোন করেন। তার সঙ্গে যখন ফোনে কথা বলি, তখন টেলিফোন আবিষ্কারককে ধন্যবাদ দিই। তিনি বোধহয় প্রবাসে থাকা স্বামী-স্ত্রীদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এই টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন।

আমার স্বামী বলেছেন, কাগজপত্র সব তৈরি। এখন শুধু অপেক্ষার পালা, বৃটিশ এমবাসি কখন ডেকে আমার হাতে এন্ট্রির কাগজ ধরিয়ে দেবে। সেই অপেক্ষায় আছি। এন্ট্রি পেলে দেরি না করে আমার প্রবাসী স্বামীর কাছে চলে যাবো।

মৌলভীবাজার থেকে

খুজি তারে আমি

– মৌমিতা ফেরদৌস চৌধুরী

আমার বাবা যখন প্রথমবারের মতো আমেরিকায় আসেন তখনো আমার জন্ম হয়নি। বাবা এসেছিলেন পিএইচডি করতে। কিছুদিন পর মাও এলেন। আমার জন্ম হলো। বাবা পিএইচডি করার পর ওহাইও ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করার সুযোগ পেলেন। থেকে গেলেন আমেরিকাতেই।

প্রচলিত অর্থে আমি হয়তো বা প্রবাসী নই। কারণ আমার জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন সবই এই দেশে। তবু মনের ভেতরে কোথায় যেন অনুভব করি আমি পরবাসী। এই দেশ আমার নয়। আমার দেশ বাংলাদেশ। আমার ভাষা বাংলা। বাংলাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন আমার বাবা। আমাকে তিনি বাংলা পড়তে শিখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তিনিই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমার এই একুশ বছরের জীবনে বাংলাদেশে এসেছি এবার মিলে মোট আটবার। প্রতিবারই এসেছি ফেব্রুয়ারি মাসে। শহীদ দিবস, ফাল্গুন উৎসব, বইমেলা, ভালোবাসা দিবস সব মিলিয়ে এই মাসটা অসাধারণ। এই মাসে বাংলাদেশের আবহাওয়া, তাপমাত্রা থাকে খুবই চমৎকার। আরো একটি কারণে এই মাসটি আমার কাছে অনন্য। এক জ্বলজ্বলে স্মৃতির স্বাক্ষর রেখে গেছে এই ফেব্রুয়ারি আমার জীবনে।

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একবার বাংলাদেশে এলাম। আমরা দেশে এলে বড় চাচার বাসা বনানীতে উঠি। চাচাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে দারুন হই চই করে সময় কাটছিল আমাদের। কুমিল্লা থেকে দাদা-দাদিরাও এসে পড়লেন। দারুণ আনন্দের সময় তখন।

সে বছর আমরা সবাই মিলে স্থির করলাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ পহেলা ফাল্গুন গাড়ি নিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হবো। মহা উৎসাহে বাবা-মা, বড় চাচা, চাচাতো ভাই-বোনসহ আমি ও আমার ভাই মোট আটজনের একটা দল মাইক্রোবাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য গাজীপুরের দিকে যাবো। কিন্তু উত্তরা পেরিয়ে টঙ্গির কাছাকাছি আসতেই একটা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। আমাদের ড্রাইভার মারা গেলেন হাসপাতালে নেয়ার পথেই। আমার অবস্থা গুরুতর। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। বাকিদের অবস্থা তেমন আশংকাজনক নয়।

দুর্ঘটনার পরের ঘটনাগুলো সবই আমার ছোট চাচার কাছে শোনা।

ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে আমাদের ভর্তি করানোর পর ডাক্তার জানালেন, আমাকে দ্রুত রক্ত দিতে হবে। আমার রক্তের গ্রুপ 'ও' নেগেটিভ। হাসপাতালে ভিড় করেছেন আমাদের সব আত্মীয়স্বজন। কিন্তু কারোরই রক্তের গ্রুপ 'ও' নেগেটিভ নয়। দাদার সঙ্গে আমার গ্রুপ যদিও মেলে তবুও তিনি বয়সে ষাটোর্ধ। অগত্যা ব্লাড ব্যাংকে খোজ নেয়া হলো। কিন্তু কোথাও নেই। *সন্ধানী, রেড ক্রিসেন্ট, বাঁধন,* ঢাকার বিভিন্ন বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক কোথাও নেই। বিকাল পাচটার দিকে টিভিতে প্রচার করা হলো একজন মুমূর্ষূ রোগীকে বাচাতে...।

প্রচারের তিন মিনিটের মাথায় একটা ফোন এলো। একটা ছেলে রক্ত দিতে রাজি আছে। তার রক্তের গ্রুপ 'ও' নেগেটিভ। হাপ ছেড়ে বাচলো সবাই।

আমি তখন ইমার্জেন্সিতে। আমাকে রক্ত দেয়া হলো। তিন দিন পর কিছুটা সুস্থ হলাম। শরীরে বেশ কিছু সেলাই এবং ডান পায়ে প্লাস্টার নিয়ে বাসায় এলাম।

সুস্থ হওয়ার পর আমাকে যে ছেলেটি রক্ত দিয়েছিল তার সম্পর্কে কৌতূহলী হলাম। আমার জীবন–মৃত্যুর মধ্যেখানে যে ছেলেটি দেয়াল হয়ে দাড়িয়েছিল তাকে দেখতে চাইলাম। কিন্তু কোথায় পাবো তার ঠিকানা? ছোট চাচা হাসপাতালের কাগজপত্র ঘেটে বের করলেন একটা ডোনার ফর্ম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ফর্ম পূরণ করেছিল ছেলেটির কাছ থেকে রক্ত নেয়ার সময়। সেখানে তার নাম লেখা ছিল গোলজার হোসেন উজ্জ্বল, বয়স ১৯। বর্তমান ঠিকানা বালুঘাট, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আর ছিল ছেলেটির স্বাক্ষর। কিন্তু এই ঠিকানায় একটা মানুষকে খুজে বের করা যায় না।

আমাদের সবার চরম দুর্যোগের ওই সময়ে ছেলেটির সঙ্গে চাচা ঠিক মতো কথাও বলতে পারেননি। শুধু জেনেছিলেন ছেলেটি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে মেডিকাল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য টিউশনি করছিল। তাদের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্যস, এটুকুই। ছেলেটিকে খুজে বের করা সম্ভব হলো না। আমাদের পরিবারের কেউই ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোলো না। কিন্তু আমি কোনোভাবেই ব্যাপারটা ভুলতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল একটা ছেলে তার শরীরের কিছু অংশ আমাকে দিয়েছে। আমাকে বাচিয়েছে নতুনভাবে। অথচ তাকে দেখতে পেলাম না, কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারলাম না।

সে বছর মার্চে আমেরিকা ফিরে গেলাম। তারপরও ভুলতে পারলাম না। ভেতরে ভেতরে এক ভয়াবহ দহনে জ্বলতে লাগলাম। আমার শরীরের ভেতরে রক্তের প্রবাহে তার অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করলাম। কল্পনার চোখে তাকে ভাবতে লাগলাম। অন্তর্চোখ দিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করলাম ছেলেটি দেখতে কেমন হতে পারে, সে কেমন করে কথা বলে, কেমন করে হাটে।

এরপরের অংশ আরো জটিল। ছেলেটার সঙ্গে কল্পনায় আমি বেড়াতে যেতাম। ফ্লোরিডার বিচে তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতাম। নিউ জার্সির বিচে সমুদ্র স্নান করতাম। লং ড্রাইভে যেতাম। আমার ভেতরে কিছুটা অস্বাভাবিকতা জন্ম নিতে শুরু করলো। বাবা–মা প্রথম প্রথম বিষয়টিকে বাড়াবাড়ি মনে করতেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তারা আমাকে অ্যাবনরমাল ভাবতে শুরু করলেন। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাহায্য নেয়া হলো। আমাকে অনেকভাবে তিনি বোঝাতে শুরু করলেন। কিন্তু শুধু ওই একটি ব্যাপার ছাড়া আমার সব কিছুই ঠিক ছিল। অবশ্য দিন দিন অন্তর্মুখী হয়ে যেতে শুরু

করলাম। বন্ধু–বান্ধব কমে গেল। ছেলেটির জন্য আমার শূন্যতা বোধ কাটলো না, বরং বাড়লো। কল্পনার দেখা সেই মানুষটিকে বাস্তবে দেখার জন্য আমার আকুলতা বাড়তেই থাকলো।
আবার দেশে এলাম। কিন্তু কোথায় পাবো তাকে? আমি জানি ছেলেটির দেয়া রক্তের কোষগুলো এতোদিনে মরে গিয়েছে। আমার শরীর স্বাভাবিক নিয়মে নতুন রক্ত উৎপাদন করেছে। তবে তার রক্তের ঋণ শোধ হয়নি। আমার শরীরে তার অনুরণন ফুরোয়নি, বরং কষ্ট হয় কেন যে রক্তের কণিকাগুলো মরে যায়! তার দেয়া রক্তগুলো স্মৃতিস্বরূপ যদি বেচে থাকতো আজীবন? আমার নতুন এই জীবন, এই প্রাণসত্তা, এতো তারই উপহার। আমার অস্তিত্বের মাঝে মিশে আছে তার দান।
এ বছর ফেব্রুয়ারিতে আবারও বাংলাদেশে এলাম। বই মেলা থেকে কিনলাম নজরুল রচনাবলী। নজরুলের একটি গানের লাইন আমাকে আজ সারা দিন খুব আলোড়িত করেছে। মাথায় ঢুকে গেছে শব্দগুলো। *আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজি তারে আমি আপনায়।*
উজ্জ্বল, আপনাকে আমি খুজছি। আপনি কি এই লেখাটি পড়ছেন? আপনার কি মনে পড়ছে এক ফেব্রুয়ারিতে আপনি একটি ষোল বছরের কিশোরী মেয়েকে রক্ত দিয়ে বাচিয়েছিলেন আজ থেকে পাচ বছর আগে? প্লিজ, যদি লেখাটি পড়ে থাকেন তাহলে একবার অন্তত যোগাযোগ করুন। আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

নিউ জার্সি থেকে

উজ্জ্বল লক্ষ্য করুন : আমার ঠিকানা যাযাদি সম্পাদকের কাছে দেয়া হয়েছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আকাশ- কুসুম

– সাজেদ হায়দার

এমনিতে সদাব্যস্ত প্রবাস জীবনে উদযাপনের উপলক্ষে আমরা প্রবাসীরা খুব একটা পাই না।ঈদ পার্বনে নিকটস্থ বাংলাদেশি পরিবারে নিমন্ত্রণ এবং দীর্ঘ মসৃণ হাইওয়ে ধরে অস্ট্রেলিয়ান সৌন্দর্যের বুক চিরে লং ড্রাইভ ছাড়া একঘেয়েমিতে ভরা নিয়মতান্ত্রিক জীবন। প্রিয়জনকে ছেড়ে আমাদের প্রবাসে পাড়ি জমাতে হয় জীবনের প্রয়োজনে...। অস্ট্রেলিয়াতে মূলত ছাত্রদের ভিড়ই বেশি। যারা এক বুক স্বপ্ন নিয়ে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের লক্ষ্য দেশ ছেড়েছে এদের কেউ দেশকে ভুলে যায়নি। এদের সবারই রক্ত, ধমনী, শিরায় প্রাণের দেশ বাংলাদেশ। আমার প্রবাস জীবনে পাওয়া সবচেয়ে বেশি কষ্টটি নিয়ে লিখছি।
মেলবোর্নের ঈদুল আজহার দিন ১১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড কাপ মিশন শুরু। ঈদের আনন্দ এবং প্রিয় দলের খেলা অচেনা আনন্দে উদ্বেলিত আমরা। আমি যে এলাকায় থাকি (কিং সবারি) তার আশপাশে বেশ কিছু বাংলাদেশির নিবাস। এদের সঙ্গেই খেলা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। সবাইকে দেখেছি বাংলাদেশকে নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করতে। না, কোনো আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা না। সাধারণত যৌক্তিক আশাবাদ, পরিমিত স্বপ্ন, ওয়ার্ল্ড কাপে দুটি জয় বিশ্ব কৃকেটের নিচের সারির দুটো দলের সঙ্গে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিচরণ, অভিজ্ঞতায় যাদের চেয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে। এবং শক্তি ও মেধায়ও আমাদের দল এগিয়ে আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ঈদের রাতে নিমন্ত্রণ শেষে বাসায় ফিরছি। বাসায় বিশাল আয়োজন। বিশ্ব কৃকেটের অতিথি কানাডার সঙ্গে আমাদের দামাল ছেলেদের লড়াই। স্থানীয় সময় আনুমানিক রাত দশটা রাস্তায় নেমে লক্ষ্য করলাম রাস্তার দুই পাশের অধিকাংশ বাড়িই নীরব-নিথর ঘুমন্ত পরী।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া তখন খেলছে সাবেক চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের সঙ্গে। কিন্তু গৎবাধা জীবনে অভ্যস্ত অস্ট্রেলিয়ানদের তাতে কোনো উৎসাহ নেই। তারা আসন্ন পরবর্তী কর্মময় জীবনের প্রস্তুতিতে ফিরে গেছে বিছানায়। তারা জানে তাদের দল জিতবে। হয়তো জিতে নেবে শিরোপা। কিন্তু আমরা বাংলাদেশিরা বড় বেশি আবেগপ্রবণ। স্থানীয় সময় রাত প্রায় এগারোটায় শুরু হতে যাওয়া খেলা নিয়ে আমাদের উৎসাহের কোনো শেষ নেই। ক্রমেই উৎসবমুখর গ্যালারি হয়ে উঠলো আমার বাসার লাউঞ্জ। কেউ কোক, কেউ চিপস, কারো হাতে চকলেট। কিন্তু সবার মধ্যে একটি দারুণ মিল, সবাই আত্মবিশ্বাসী এবং আসন্ন গৌরবান্বিত জয়কে বরণ করতে উদগ্রীব। তুমুল হই চই-এর মধ্য দিয়ে কানাডার ব্যাটিং শেষ হলো।

মোবাইল স্কোরার হিসেবে কর্মরত বন্ধুদের অনবরত স্কোর সরবরাহ করতে করতে ব্যস্ত সময় কাটালাম। আমরা আনন্দিত। বিরতির সময় স্ফীত হয়ে এলো আমাদের মতো অতি সাধারণ কৃকেট বোদ্ধাদের অসাধারণ কৃকেটীয় বিশ্লেষণে। কিন্তু বাংলাদেশের ইনিংসের সময় যতোই গড়িয়ে চললো, আমাদের আনন্দ ক্রমেই ফিকে হতে শুরু করলো। আমরা দেখলাম ইমিগ্রান্টদের নিয়ে গড়া অপেশাদার কানাডিয়ান দলের পরিশ্রমী কৃকেট। এবং মেলবোর্ন সময় ভোর রাত প্রায় পাচটায় আমাদের স্বপ্নের অপমৃত্যু হলো। আমরা সবাই নির্বাক।

আসলে স্বপ্ন হয়তো স্বপ্নই। তাই বাস্তবতা পায় না। আমাদের ছোট্ট কিন্তু জমজমাট গ্যালারি ফাকা হতে শুরু করলো। একখণ্ড বাংলাদেশ লজ্জায় রক্তিম নীরব-নিথর। মিশ্র সংস্কৃতির দেশে বিভিন্ন জাতির সামনে আমাদের মাথা হেট হলো আরেকবার। হয়তো প্রাপ্তিটা একটু বেশিই এবার।

বাইরে আলো ক্রমেই দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই তখন শুরু করবে কর্মময় দিন। কেউ কেউ হয়তো রাতে কাজ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিল লাল-সবুজ পতাকার অবাধ ওড়ায় বুক ভরে শ্বাস নিতে। ফিরে যাচ্ছে বিছানায় পরবর্তী রাতের কাজের প্রস্তুতিতে এবং নিজের অবোধ মনকে ধিক্কার জানাচ্ছে একরাত কাজ না করার অর্থ নষ্ট পরবর্তী সপ্তাহে বেশি কাজের আশংকায়।

এভাবেই আমরা কাটালাম অধীর প্রতীক্ষিত দিনটি। আমি কোনো কৃকেটের বিশ্লেষণে যেতে চাই না। সেই যোগ্যতাও আমার নেই। চাই না কৃকেটারদের কাছ থেকে শ্বাসরুদ্ধকর ধ্রুপদী কৃকেট প্রদর্শনী অথবা চাই না তাদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাড় করাতে। যেহেতু বাংলাদেশ দলের অনেকেই তরুণ এবং এদের অনেকের সামনে রয়েছে দীর্ঘ দিন জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সেহেতু তাদের প্রতি একই প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদেরকে একটু বুক ফুলিয়ে দাড়ানোর প্রাণ খুলে হাসার উপলক্ষ্য এনে দিন। আকাশ-কুসুম স্বপ্ন আমরা কেউই দেখি না। তবু মনে হয় আমাদের দেখা সব স্বপ্নই বুঝি আকাশ-কুসুম।

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া থেকে

বাচ্চা

– প্রভা

একদিন রাজশাহী মেডিকালের ওখানে রিকশা পাচ্ছি না। আমার টুকটুকে বাচ্চা নিয়ে হাটছি। বাচ্চা বলছে, মামণি কোলে, মামণি কোলে।

সেখানে কতোকগুলো ছাত্র ছিল। দুষ্টুমি করে বলে উঠলো, আব্বু, তোমার ড্যাডি লাগবে না, ড্যাডি? আরেকজন বলে উঠলো, ড্যাডির কোলে চড়ে বেড়াতে হয়।

ভাগ্যিস জিভে কামড় দিয়ে হাসি চাপতে পেরেছিলাম। বাচ্চাকে মার্কেটে নিয়ে গেছি, বললাম, বাবা, কোন কোন খেলনা নেবে দেখো। এদিকে দোকানদার তো কয়েকটা খেলনা চালিয়ে রাখলো। বাচ্চা মাথা নিচু করে আছে।

বললাম, কি হলো?

বাচ্চা বলে উঠলো, মামণি আমাকে একটা বাবা কিনে দাও না।

আমি শুনে থ।

দোকানদার বলে উঠলো, আপা, বাচ্চার বাবা নেই?

দোকানদারের দিকে রেগে কটমট করে তাকিয়ে গট গট করে বেরিয়ে এলাম।

নানির কোলে বাচ্চা বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক লোককে দেখে বলে উঠলো, ওই লোকতা খুব থুন্দর (সুন্দর)। ওতা আমার বাবা হয়।

ওর নানি তো হেসেই খুন।

এভাবে রেডিও টিভির কথা শুনে বলে উঠতো, আমার বাবা কথা বলছে। ফোন এলে বলতো বাবা *বাতায়* (বাসায়) আত, বাত (ভাত) দেবো, কমমা (কমলা) দেবো।

আমি বকলে দৌড়ে নিজের কাপড়ের বাস্কেট টেনে নিয়ে যাবে বারান্দায়। সবাইকে বলবে রিকশা আনো। আমি রিকশায় করে সউদি চলে যাবো।

বাড়ির সবাই হেসে খুন।

একদিন বাচ্চা জানালায় উঠে বলছে আল্লাহ, আমাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাও তো। বাবার কাছে বেড়াতে যাবো, মামণিকেও নিয়ে যাবো।

একদিন আমি ঘুমে। বাচ্চা দৌড়ে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলছে, মামণি বাবা এসেছে, বাবা এসেছে বলে দৌড়ে ছুটে বারান্দায়।

আমি তো ঘুম ভেঙে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখি কিছুই না। ক্ষেপে গিয়ে বললাম, কই বাবা এসেছে?

বাচ্চা আকাশে আঙুল উচিয়ে বললো, প্লেন এসেছিল, ওটায় বাবা আছে।

হাসবো, না কাদবো! ভাঙ্গা মনে এসে আবার শুয়ে পড়লাম। বাচ্চা তার নতুন খালুকে সমানে বাবা ডেকে যাচ্ছে। আমি তো লজ্জায় বাচি না। ধমক দিলাম।

দুলাভাই বললো, সে যদি শান্তি পায় তাহলে ডাকুক না, ক্ষতি কি?

এয়ারপোর্টে তাকে রিসিভ করতে গেছি। বাবা বাচ্চা চেনে না। ছবি দেখেছে। হঠাৎ তার বন্ধু তার পাশে দাড়িয়ে বললো, কোনটা তোমার আব্বু। পাশাপাশি দুই বন্ধু দাড়িয়ে আমি তো বিব্রত হয়ে পড়েছি। মুখ দেখে বাচ্চা শেষে বাপকেই গিয়ে ধরে ফেললো।
এখন সে বাচ্চা বড় হয়েছে। এখন ফোন এলে বলে, আমাদের তো তোমার দরকার নেই। প্রয়োজন থাকলে তো ফেলে রাখতে না, কাছেই রাখতে।
এই হচ্ছে প্রবাসীর বাচ্চাদের কষ্ট। বাচ্চাদের কষ্টে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই হতবাক হয়ে যাই।

দক্ষিণ রাঘবপুর, পাবনা থেকে

দেশপ্রেম

– জয়

জীবনে দুঃখজনক পরিস্থিতি উত্তরণের বিকল্প পথ খুজে না পেয়ে একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে দেশান্তরী হওয়ার প্রস্তুতি নিই। কোনো অগ্রিম নয়, প্রবাসে পৌছে ফোন করলে উভয়ের পছন্দের তৃতীয় মাধ্যম থেকে আমার জমা দেয়া নির্দিষ্ট অংকের টাকা দালাল নেবে এই শর্ত সাপেক্ষে রাজি হই। প্রথমবার ভিসাযুক্ত পাসপোর্টধারী অন্যজনের ছবি পরিবর্তন করে আমার ছবি লাগিয়ে পাঠালে জাল ভিসার জন্য সাত দিন নারিতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের হেফাজতে রেখে আমাকে দেশে ফেরত পাঠায়। *গুরু পাপে লঘু দণ্ড!* দ্বিতীয়বার ইনডিয়ান পাসপোর্ট–ভিসাতে একই পদ্ধতিতে জাপানের নয়নাভিরাম কানসাই বিমানবন্দর দিয়ে পাঠালে কি ভেবে ঢুকতে না দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কানসাই বিমানবন্দরটি সমুদ্রের ওপর ভাসমান এবং ব্যয় বহুল।
দুইবার ফেরত এসে আমি হতাশ হলেও অভিজ্ঞ সাহসী দালাল দক্ষিণ কোরিয়া নিয়ে অন্য দালালের মাধ্যমে চোরাই পথে স্পিডবোটে পুশান সামুদ্রিক বন্দরের অদূরে নোঙর করা এলজেরিয়ান একটি জাহাজে উঠিয়ে দেয়। জাহাজে মৃত্যুফাদ তুল্য ছোট একটি অন্ধকার গোপন রুমে আমিসহ আরো দশজনকে ঠাসাঠাসি করে বসিয়ে উপর থেকে এটি আটকিয়ে রাখে।
কোনো জাহাজে অবৈধ লোক ধরা পড়লে ক্যাপটেনের জেল–জরিমানা এবং বন্দরে ওই জাহাজ ভেড়ানোর অনুমতি বাজেয়াফত করা হয়।
অন্ধকার কুঠুরিতে বসে এক অজানা আশংকায় সৃষ্টিকর্তাকে নিরন্তর ডাকতে থাকি। দোজখের খানিকটা আলামত যেন। সেই স্মৃতি হঠাৎ মনে পড়লে আজও গা কাটা দিয়ে ওঠে। কেউ কেউ জীবনের আশা ছেড়ে দেয়। ক্যাপটেন বিপদের আচ করতে পারলে নিজেকে রক্ষার জন্য যাত্রীদের আর উপরে ওঠায় না। অতিরিক্ত সময় পার হলে অক্সিজেনের অভাবে মানুষ এমনি মারা যায়। পরে সুযোগ মতো সমুদ্রের গভীরে লাশ ফেলে দেয়। সলিল সমাধি। জীবনকে ভালোবাসি বলেই জীবনের জন্য যুদ্ধ করি। তাই বলে হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে যুদ্ধ! এভাবে পথ পড়ি দিতে হবে জানলে কেউ এ পথে পা মাড়াতো না।
জাহাজের ক্রু আমাদের হিসেবে নিরাপদ পারাপারের প্রতিশ্রুতিতে জাহাজে তুলেছিল দালাল। সান্ত্বনাস্বরূপ নকল কার্ড ছবিসহ ছাপিয়ে আমাদের হাতে দিয়েছিল। কিন্তু জাহাজে ওঠানোর পর ভয় দেখিয়ে তাদের হাতের পুতুল করে ফেলে। জাহাজ ছেড়ে যাবার আগ পর্যন্ত ইমিগ্রেশনের তল্লাশি,

মালপত্র পরীক্ষা করে ছাড়পত্র, কোরিয়া জলসীমা পর্যন্ত নৌবাহিনীর জাহাজ এগিয়ে দেয়ার পর নিরাপদে গিয়ে আমাদের উপরে তোলার পর সবাই আধামরা।

তিন দিনের যাত্রায় প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের নিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অন্তত চারবার লুকোচুরির পর জাহাজের কর্মচারীদের অনুগ্রহ, সহযোগিতা, চাতুর্যে অত্যন্ত সন্তর্পণে জাপানের মাটিতে পদার্পণ করি যেন অবিশ্বাস্যভাবে চমৎকার পৃথিবীর সৌন্দর্য আবার দেখছি। ভাবতেই আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া জানাই। শরৎচন্দ্রের সমুদ্রে সাইক্লোন, রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনীতে জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়লে লেখক একটি ভেড়ার খাচায় আশ্রয় নিয়ে জীবন বাচিয়েছিলেন। আমরা তেমন কোনো অবস্থার মুখোমুখি না হলেও বিব্রতকর অবস্থার মধ্য দিয়ে এক ভয়াবহ ভীতিকর ভ্রমণ শেষ করেছি। এক অশুভ শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে গন্তব্যে পৌছানো ছিল রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। অন্ধকার গুহায় অসহনীয় যন্ত্রণায় কাটিয়ে মিথ্যাবাদী দালালের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করলেও নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছি যেন ফিরে পেয়েছি নতুন জীবন।

জাপানে পৌছে পরিচিত মহলের সহায়তায় জাপানের আদি নাম নিহোন, নিপ্পন-এ সহসাই কাজ জুটে যায়। কর্মচঞ্চল জাপানিজদের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে কর্মবিমুখ আমি প্রথমত. হতাশ হয়ে পড়ি। দ্বিতীয়ত. হাপিয়ে উঠি। তৃতীয়ত. কষ্ট হলেও মানিয়ে যাই। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অনুকরণে রোবটের মতো তৎপর হয়ে যাই। পিপীলিকার মতো কর্মতৎপরতা। শিগগিরই বুঝতে পারি মেধা, মননশীলতা, একাগ্রতার অপূর্ব সমন্বয়ের জন্যই দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে ঈর্ষনীয় উন্নতির শিখরে। কাজের পরিধি, বেতন, আচার-আচরণে প্রবাসের নিঃসঙ্গতা অচিরেই কেটে যায়। পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, অথচ দেশের প্রতি অন্তঃপ্রাণ এক চমৎকার মনের অধিকারী মালিকের অধীনে কাজ করি।

১৯৯৫ সালের কথা। দিন, তারিখ মনে নেই। কাজের অবসরে তার দেশের এক দেশপ্রেমিকের কথা তিনি শোনালেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যে সেনাপতির নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি আমাদের কথোপকথনের আগের দিন মারা গেছেন। যুদ্ধে হেরে যাবার পর সে দেশের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাড়িয়ে বলেছিলেন, যে ভুল, যে অপরিসীম ক্ষতি তার জন্য হয়েছে সে জবাবদিহিতার নৈতিকতা বিন্দুমাত্র তার অবিশষ্ট নেই। ক্ষমা চেয়ে পার পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারলে হয়তো ক্ষত কাটিয়ে ওঠা যাবে।

সকল ভেদাভেদ ভুলে দেশ গঠনের প্রত্যয়ে সবাই সেদিন থেকেই উঠেপড়ে লেগেছিল। তারই ধারবাাহিকতার সফলতার নিদর্শন সর্বত্র। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাপানকে আজকের অবস্থায় তুলে আনার জন্য যাদের অবদান জাপানবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে, সেদিনের সেই পরাজিত সেনাপতি তাদের অন্যতম। জাপানিজদের জাতীয় বীর। তবুও আমাদের মতো এর মৃত্যুদিন, জন্মদিন নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা নেই।

জাপানিজরা তাদের অসীম প্রাণশক্তি দিয়ে পুরনো ভগ্নস্তূপের ওপর দাড়িয়ে নতুন করে গড়ে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করে সফল হয়েছে। অথচ আমরা বাংলাদেশিরা স্বাধীনতার ৩২ বছর পরও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকোচ, লজ্জা, ব্যর্থতাকে বিসর্জন দিয়ে দেশ গড়তে পারিনি বলেই জীবনবাজি রেখে আর্থিক সচ্ছলতার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাই। বাংলাদেশে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার বড়ই অভাব।

প্রায় এক যুগ আগে পশ্চিমা বিশ্বের এক ঝানু সাংবাদিক বাংলাদেশ ঘুরে যাবার সময় বলেছিলেন, *এ দেশে সমকালীন প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন রাতারাতি সম্ভব নয়। যদি ঈশ্বর সদয় হয়ে কোনো দেবদূতকে মানুষের আকৃতিতে এ দেশে পাঠান তাহলেই সম্ভব।*

আমরা সেই দিনের প্রত্যাশায়।

ঢাকা থেকে

ডায়মন্ড

– আবদুল বারী

আমার বাবার অনেক দিনের আশা বিদেশ গিয়ে আমি পড়াশোনা করবো। আমার আত্মীয়রা প্রায় অনেকেই বিদেশে থাকতো। অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন এবং আবু ধাবি। আমার ইচ্ছা ছিল অস্ট্রেলিয়া গিয়ে পড়াশোনা করবো। হয়তো আল্লাহপাক আমার এবং বাবার ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। তাই তো অস্ট্রেলিয়া গিয়ে এমবিএ পড়তে পেরেছি। এই অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পর যা হয়েছিল সেসবের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার এ লেখা।

তারিখটা আমার আজও মনে আছে। ১৯৯৭ সালের ৪ মার্চ। সকাল নয়টায় আমার ফ্লাইট। প্লেনে উঠেই বেশ ভালো লাগছিল বিদেশ যাচ্ছি বলে। যাহোক, আমরা সিডনি হয়ে ওয়েগা সিটিতে গিয়ে পৌছালাম তখন রাত আটটা। আমাকে রিসিভ করতে আসার কথা ছিল ইউনিভার্সিটি থেকে। কিন্তু এয়ারপোর্টে নেমে দেখলাম কেউ আসেনি।

চিন্তায় পড়লাম। নতুন জায়গা। আবার রাত। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। সেই সময় এয়ারপোর্টে কর্মরত একজন লোকের সঙ্গে কথা বললাম এবং আমার সমস্যাটা জানালাম।

আমাকে তিনি পরামর্শ দিলেন ট্যাকসি নিয়ে ওয়েগা ইউনিভার্সিটিতে একাই চলে যাবার জন্য। আমি যেহেতু ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসেছি সেহেতু তারাই আমার সব ব্যবস্থা করবে। তার সুপরামর্শে ট্যাকসি নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পৌছালাম। তখন রাত সাড়ে নয়টায়। ট্যাকসি আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেল। আশপাশে কাউকে না দেখে চিন্তাই পড়লাম।

রাত কিন্তু কোনো সিকিউরিটি গার্ডও সেখানে নেই। শুধু কয়েকটা ফোনসেট চোখে পড়লো। কিছু লেখা দেখে বুঝলাম এটা অটো রিংগার। রিং করতে হয় না। রিসিভার ওঠালেই রিং হয়। সাহস করে ফোন কানে ধরলাম। তখন ওই পাশ থেকে একটা মহিলার কণ্ঠ শুনলাম। কি বললেন বুঝতে পারলাম না। তার কথা শেষ হতেই আমার পরিচয় দিলাম এবং সমস্যার কথা বললাম। তিনি আমাকে ওখানেই দাড়িয়ে থাকতে বললেন। কথাগুলো সব ইংরেজিতেই হচ্ছিল।

ফোন রেখে মিনিট খানেক দাড়াতেই দেখলাম একটা শাদা গাড়ি এসে যে বিল্ডিং থেকে ফোন করেছিলাম সেই বিল্ডিংয়ের পাশে দাড়ালো। গাড়ি থেকে একজন পুলিশ ও একজন সিভিল ড্রেস পরা লোক এসে আমার নাম উচ্চারণ করলো এবং বললো, আপনি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট? আমরা আপনাকে রিসিভ করতে এসেছি।

গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গাড়ি ক্যাম্পাসের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল। তাই কোনো চিন্তা করিনি। একটু পরেই গাড়ি থামলো। দেখলাম লাইট জ্বলছে। লেখা আছে অফিস!

গাড়ি থেকে নেমে অফিসে গেলাম। তারা আমার সব ব্যবস্থা করলো। বললো, কাল ভর্তি হবেন এবং সাত দিন পরেই ক্লাস শুরু হবে। আপনি হস্টেলে ৩০৪ নাম্বার রুমে থাকবেন। এখন সামারের ছুটি চলছে। তাই হয়তো আপনার কোনো রুমমেটকে দেখবেন না। তবে সাত দিন পরে সবাই আসবে।

আমাকে ওই দুজন লোক মিলেই হস্টেলে রেখে এলো। ডিনার আমার রুমে বসেই সারলাম। যিনি আমার খাবার দিয়ে গেলেন তিনি একজন শ্বেতাঙ্গিনী। তিনি খুব ভদ্র। আমাকে বললেন, আপনি গেস্ট। তাই আজকে এখানেই খাবার পাচ্ছেন। কিন্তু আগামীকাল থেকেই আপনাকে ডায়নিং স্পেসে গিয়েই খেতে হবে।

বাংলাদেশে এই শাদা চামড়ার কাউকে দেখলেই চেয়ে থাকতাম। কিন্তু আজ তারা আমার রুমে আমার সেবা করছে। ইচ্ছা হচ্ছিল তার সঙ্গে আরো কিছু কথা বলি। কিন্তু খুব টায়ার্ড ছিলাম। তাই আর কথা বললাম না। ভাবলাম এদের সঙ্গেই আমার বাস করতে হবে। অনেক কথা বলার সময় পাওয়া যাবে। রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে চিন্তা করলাম বিদেশে আসা নিয়ে। পত্রিকায় কতো না বেদনা, বিষাদের কথা পড়েছি। কিন্তু আমার তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। আল্লাহর কাছে শোকর করলাম।

পরদিন সকালে এগারোটায় আমার ভর্তি শেষ হলো। দিনের আলোয় সমস্ত ক্যাম্পাসটাকে এক রহস্যময় দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। প্রচুর গাছ। তবে সবই অচেনা। হেটে হেটে যতো দূর ঘুরে দেখা সম্ভব দেখলাম।

এখানে ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশের মতো ক্যাম্পাসে জোড়ায় জোড়ায় বসে গল্প করে না। কেন করে না তা পরে বুঝতে পেরেছি। সাত দিন শেষ হলো। সোমবারে আমাদের নতুন সেমিস্টারের ক্লাস শুরু হলো। সব কিছু ঠিক মতোই ছিল। আমার রুমমেট একজন অস্ট্রিয়ার বাসিন্দা। তার সঙ্গে গল্প করে হিটলার সম্বন্ধে জানা হলো। আর ইংরেজি চর্চা যেন মুড়ির মোয়া হয়ে গেল।

আমাদের ক্লাস টিচার রাশিয়ার নাগরিক। তার পরিচয় এবং আমাদের পরিচয় পর্ব শেষ হলো। কিন্তু বাদ সাধলো একজন বোরখা পরিহিত ছাত্রী যিনি সউদির নাগরিক। ক্লাস টিচার তার মুখের কাপড় সরাতে বললেন। কিন্তু সে কোনোক্রমেই ওই বোরখা খুলবে না। অবশেষে ধর্মের কথা বলে তার আর বোরখা খুলতে হলো না।

পরে দেখলাম হস্টেলে মেয়েটির সিট ঠিক আমার অপজিট সাইডে পড়েছে। তার সঙ্গে আমার সব সময় দেখা হতো। গেট খুললে শুধু দেখা যেতো তার দুটি মায়াবী চোখ। দেখলাম এ দেশের কালচারে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না। তাকে দেখলে মনে হয় সে বড় বেশি একা। আমিও মুসলিম, নামাজ পড়ি। সেও মুসলিম। এই একটা বড় মিল ছিল তার আর আমার মধ্যে। ভালোই কাটছিল দিনগুলো।

একদিন হঠাৎ কে যেন বললো, এক্সকিউজ মি।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পেছনের দিকে তাকালাম। তাকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে আরো বেশি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একি! এ যে সেই অ্যারাবিয়ান। তার দিকে চেয়ে বললাম, আমি?

সে বললো, হ্যা।

তার কাছে এগোতেই সে বললো, কিছু সময় দেবেন?
বললাম, অবশ্যই।
সে আমাকে যা বললো তা শুনে আরো বেশি অবাক হলাম।
সে বললো, আপনি কি আমার বন্ধু হবেন?
আমি চুপ করে রইলাম।
সে বলে চললো, আসলে আমি তেমন কোনো সঙ্গী খুজে পাচ্ছি না যার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাবো। এখানে অনেক এশিয়ান স্টুডেন্ট রয়েছে। তবে তারা এ দেশের কালচাটাকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। কিন্তু আপনি তাদের থেকে একটু আলাদা। তাই আপনাকেই আমার বেশি ভালো লেগেছে।
কথা বলার সময় তার হাতের দিকে তাকিয়েছিলাম। এতো সুন্দর তার হাত! এই শাদা চামড়াদের মতো ফর্শা নয়। হলুদ রঙয়ের সঙ্গে শাদার আভাস। দুর্নিবারভাবে আকর্ষণীয়।
তার প্রতি এবং তার পুরো চেহারা দেখার জন্য খুব বেশি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়লাম। শুধু সেই দিন তাকে হ্যা-এর বেশি কিছু বলতে পারিনি। কারণ আমি হয়ে পড়েছিলাম বুদ্ধি-বিবেক হারা পাগল। সে হয়তো আমার নিষ্পাপ মুখটাকে ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছিল। তাই শুধু একটা হাসির আওয়াজ পেলাম।
সেদিনটা যে আমার কি রকম আনন্দে কেটেছে তা বোঝাতে পারবো না। অপেক্ষায় থাকলাম পরের দিনের জন্য। পরের দিন বিকাল চারটার দিকে তার রুমে নক করলাম। সে গেট খুলে আমাকে ভেতরে আসতে বললো। আমি না বলে তাকে আমার সঙ্গে ক্যাম্পাসে ঘোরার জন্য বললাম। সে আমার কথায় রাজি হলো। বের হলাম দুজনে হাটতে। সেদিন তার ডাক নাম শুনলাম, জানা। খুব সুন্দর নাম।
বললাম, তুমি যেমন সুন্দর তারচেয়ে নামটা আরো বেশি সুন্দর।
সে বললো, কেমন করে বুঝলেন আমি সুন্দর।
বললাম, তোমার ওই হাত দেখে।
সে এতো লজ্জা পেল যেন হাত দুটি কোথায় লুকাবে তার জায়গা খুজে পাচ্ছে না।
এভাবে একটা বছর কেটে গেল।
সামার ভ্যাকেশনে জানা চলে গেল সিডনিতে। আমার পয়সা কম। তাই আর যাওয়া হলো না। তাকে শুধু এয়ারপোর্টে গিয়ে সি-অফ করে এলাম। চলে আসার পর কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করলাম। বিকেল হলে মনে হতো আমার জীবন থেকে কি যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে বলতে পারলাম না। এর মধ্যে জানা আমার কাছে একবারও ফোন করেনি। আমিও ইচ্ছা করেই করিনি। জানা চলে যাওয়ার পঞ্চম দিনে রাত দুটোর সময় মোবাইলে একটা মেসেজ পেলাম। লেখা আছে, আই ফিল ইউ ভেরি মাচ। আই ডোন্ট নো হোয়াই। এবং আরো লিখলো, আমি আগামীকাল আসছি।
আমি আর সেই রাতে ঘুমাতে পারলাম না। বার বার ওই মেসেজটা শুধু পড়লাম। এতো সরলভাবে লেখা তবু যেন আমার কাছে খুব কঠিন ভাষা মনে হলো। আবার নাম্বার চেক করলাম। দেখলাম এটা জানারই নাম্বার।

সে এলো।

এক বিকেলে সে কেন জানি সউদির মেয়েদের কিভাবে বিয়ে হয় সে কথা ওঠালো। নতুন কালচার জানতে পারছি ভেবে ভালোই লাগলো। সউদি মেয়েরা নাকি শুধু সে দেশেরই ছেলেদের বিয়ে করতে পারে।

সে হাসতে হাসতে বললো, অনেক বাঙালি ছেলেরা তাদের দেশে গিয়ে অনেক মেয়ের প্রেমে পরে। কিন্তু কঠোর আইন তাদের প্রেম সম্পূর্ণ হতে দেয় না। এমন ছেলে নাকিও দেখেছে যে, জেনেশুনে সেই ছেলে তাদের দেশের মেয়েকে বিয়ে করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। আর এ জন্যই সেই ছেলের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

আস্তে করে বললাম, সে তো প্রকৃত সাহসী।

আমার কথা শুনে জানা চমকে গিয়ে বললো, তোমাকে নিষ্পাপ মনে হয়। কিন্তু তুমি এতো কঠিন কথা বলতে পারলে কেমন করে?

বললাম, এটা যে তোমার দেশ নয়, তাই।

হঠাৎই জানা আনমনা হয়ে নরম স্বরে বললো, আচ্ছা, তোমাকে যে সেদিন মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম তা তুমি পাওনি?

জানা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য তুলে ধরছি। জানা হচ্ছে সউদির এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তার বাবা সউদির আমির। যারা আমির সম্পর্কে জানেন তাদের কাছে আর নতুন করে কিছু বলতে হবে না। জানা শুধু উচ্চ শিক্ষার জন্য এই দেশে এসেছে। তার বাবার বিশাল কম্পানি পরিচালনা করা তার দায়িত্ব। যদিও তার বাবা তাকে এ দেশে আসতে নিষেধ করেছে তবুও সে এসেছে। কারণ সে বড় দায়িত্ব পালন করছে। তাই উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে।

আমি জানতাম জানা লেখাপড়া শেষ হলেই সউদিতে ফিরে যাবে। হাসতে হাসতে বললাম, মেসেজ পেয়েছি কি না তা যদি জানতে চাও তাহলে তোমাকে কাল আমার রুমে আসতে হবে। বলেই আমরা হস্টেলে ফিরে এলাম।

অপেক্ষায় থাকলাম কাল বিকেলের, কখন বিকেল হবে। কখন জানার সঙ্গে দেখা হবে।

আমি কখনো জানাকে বোরখা খোলা অবস্থায় দেখিনি। একদিন জানাকে হাসির ছলে বলেছিলাম, আচ্ছা, তোমরা কি বোরখা কখনো খোলো না।

জানা হাসতে হাসতে বলেছিল, হ্যা। তবে এটা গোসলের সময় আর স্বামীর সামনে খুলি।

তার উত্তরে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। অবশেষে বিকেল হলো। আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথা।

১৯৯৯ সাল, জুলাই মাসের প্রথম রবিবার। রবিবার হচ্ছে অফ-ডে। এদিন বিকেলেই সবাই বাইরে চলে যায়। সম্পূর্ণ হস্টেল ফাকা। এদিনে বিকেলে জানা এলো। আমি তার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তাকে আসতে বললাম।

বেশ শীত পড়েছে। তাই গেট লক করলাম। জানা আমার পাশে এসে বসলো এবং বললো, উত্তরটা দাও।

বললাম, ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি। চা খাও, পরে বলবো।

জানা খুব ব্যস্ত হয়ে বললো, অনেক দিন অপেক্ষা করেছি, আর নয়। তুমি বলো।

তাকে বললাম, তাহলে বোরখাটা খুলতে হবে।

জানা জীবনে কোনো পুরুষের সামনে বোরখা খোলেনি। তাই ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল। তবুও সে উঠে দাড়িয়ে বোরখাটা খুললো।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেললাম। চাদের মতো বাকানো ঠোট। চোখ দুটো এতো সুন্দর যে তার বর্ণনা দিতে পারবো না। ফর্শা তবে হলুদের রঙ যেন মেশানো আছে। হালকা সোনালি চুল। সব মিলে বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি জানা।

আমি বোকার মতো তাকিয়ে আছি এ জন্য জানা একটা দুষ্টুমির হাসি দিল।

আমি বুঝলাম না, দুনিয়ায় না স্বর্গে বসে কোনো হুরপরীকে দেখছি। তার পাশে গিয়ে দাড়ালাম। আস্তে করে বললাম, তুমি আমার জন্য বোরখা খুললে।

সে বললো, শুধু বোরখা কেন, তোমার জন্য আমি জীবনটাও দিতে পারি। বলেই জানা আমার বুকের মধ্যে মাথা রাখলো। আস্তে করে বললো, আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তোমাকে বিয়ে করবোই।

অন্ধকারে মনে হলো, জানার রূপের আলোয় পুরো রুম আলোকিত হয়ে গেছে, লাইট জ্বালানোর প্রয়োজন নেই। এভাবে যে কতোক্ষণ কাটলো জানি না। তবে মোবাইল বেজে ওঠার জন্য জানা যখন আমাকে ছাড়লো তখন দেখি রাত নয়টা। জানা বোরখা পরে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল।

এর পরের মাসে আমাদের রেজাল্ট বের হলো। জানা রেজাল্ট নিয়ে বললো, আমি দেশে ফিরে যাবো। আগামী সপ্তাহে আমার টিকেট কনফার্মড।

জানাকে আর দেখবো না ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগলো।

প্রকৃতির নিয়মে দিন যায় রাত আসে। জানারও চলে যাবার সময় হলো। তাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিতে গেলাম। প্লেন ছাড়ার আধঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌছালাম।

জানা আমার হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললো, এটা সামান্য গিফট। আমি চলে যাবার পর দেখবে। এটা কিনেছিলাম সিডনি থেকে যেদিন তোমার কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম সেই দিন।

জানার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখলাম তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোটা পানি।

আমি জানি না কখন যে জানার হাত ধরেছি। সে আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। কাচের মধ্যে দিয়ে যতোক্ষণ তাকে দেখা যায় ততোক্ষণ দেখলাম। নিজের অজান্তে কখন যে কেদেছি জানি না। তবে দেখলাম, অশ্রুজলে শার্ট ভেজা।

জানা চলে গেল।

রেখে গেল তার স্মৃতি।

প্যাকেট খুলে দেখলাম একটা ডায়মন্ড রিং। এটা এখন হাতে পরি। যখন জানার কথা মনে পড়ে তখন নিজের অজান্তে রিংটার দিকে চোখ যায়। এরপর বহুবার জানার কাছে ইমেল করেছি, কোনো উত্তর পাইনি। ফোন করলে কোনো উত্তর পেতাম না। শুধু ফোন রাখার একটা আওয়াজ পেতাম।

আজও আমি একা থাকলে সেই কথা শুনতে পাই, *আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তোমাকে বিয়ে করবোই।*

এখন আমি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। ভালো বেতনের চাকরি পেয়েছি। বাংলাদেশের টাকায় প্রায় এক লাখ। নভেম্বরে দেশে এসেছিলাম। রোজার ঈদ আর কোরবানির ঈদ শেষ করলাম। বাবা মায়ের অনেক দিনের ইচ্ছা ছেলের বৌ দেখবেন। এই চার মাসে প্রায় দশটা মেয়ে দেখেছি। কিন্তু কাউকে আমার জানার মতো মনে হয়নি।

মা বলেছেন, যেখান থেকে পারিস একটা বৌ নিয়ে আয়। এভাবে জীবন চলে না।

কিন্তু কিভাবে মাকে বোঝাবো, জানা যে আমার জীবনে চরম সত্যি হয়ে আছে। আমার পক্ষে তাকে ছাড়া আর কোনো মেয়েকে নিয়ে ঘর করা সম্ভব নয়। তাই আজও জানার অপেক্ষায় রয়েছি। আমার অস্ট্রেলিয়া যাবার সময় হয়ে এসেছে।

জানি না জানা এখন কেমন আছে? এই প্রবাস জীবন আমাকে দিয়েছে প্রথম ভালোবাসা। তাই ভুলতে পারি না ওয়েগা সিটিকে। ভুলতে পারি না জানাকে। আমি জানি জানা মিথ্যা বলেনি। সে একদিন না একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেই। জানার ডায়মন্ড রিং পরে অপেক্ষায় আমি রয়েছি এবং থাকবোও সারা জীবন।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

নেকলেস

– আশফাকুল জলিল

উত্তর প্রদেশের সিমলা শহর অত্যন্ত সুন্দর। সিমলা অর্থ পাহাড়। মূলত সমুদ্রতল থেকে সাত হাজার ফিটেরও বেশি উচ্চতায় অবস্থিত জাকু হিল, প্রসপেক্ট হিল, অবজারভেটরি হিল, ইলিসিয়াম হিল আর সামার হিলের চূড়ায় গড়ে ওঠা জনপদ নিয়ে সিমলা।

হোটেল থেকে বের হয়ে সকালটা হুসেন ভ্যালি থেকে সিমলার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখে *তারা মন্দিরে* গেলাম। পাহাড়ের ওপর স্থাপিত ছোট্ট ছিমছাম মন্দির। কথিত আছে যে, চন্দ্ররাজসূয় যজ্ঞ শেষে কামার্ত হয়ে পড়েন এবং দেবতা বৃহস্পতির স্ত্রী তারা দেবীকে হরণ করেন। এতে চন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ বৃহস্পতি যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। দেবতা ব্রহ্মা যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা করে চন্দ্র ও তারা দেবীকে বৃহস্পতির কাছে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। কিন্তু তারা সন্তানসম্ভাবা থাকাতে বৃহস্পতি তাকে নিতে অস্বীকার করে। ব্রহ্মা তারার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে, চন্দ্রই এ সন্তানের পিতা। তখন সিদ্ধান্ত দেয় যে, তারা সন্তান প্রসবান্তে বৃহস্পতির কাছে ফিরে যাবেন। তারা সন্তান প্রসব করলে চন্দ্র তাকে নিজের কাছে নিয়ে যায় এবং বুধ নাম দিয়ে আকাশে নিজের বিপরীত দিকে স্থাপন করে। ক্ষুব্ধ বৃহস্পতি তারাকে ফিরিয়ে নিলেও চন্দ্রকে অভিশাপ দেয়। ফলে চন্দ্র ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষয় হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। চন্দ্র পরে অত্রি মুনির সহায়তায় ধীরে ধীরে নিজ গোলাকার দেহ পুনরায় প্রাপ্ত হয়। তবে বৃহস্পতির কোপ বর্তমান থাকাতে সে প্রতি মাসের অর্ধাংশ সময়ের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। অপরদিকে অত্রি মুনির বরে মাসের বাকি অর্ধাংশে পুনরায় নিজ দেহ প্রাপ্ত হয়। হিন্দু ধর্ম মতে, এর ফলেই অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা হয়ে থাকে।

মন্দিরের ভেতরে কষ্টি পাথরের চমৎকার একটি মূর্তি স্থাপিত আছে। প্রধানত. পদস্খলনজনিত কারণে স্বামী পরিত্যক্তা হিন্দু রমণীরা পুনরায় স্বামী গৃহে স্থান লাভের আশায় এখানে পুজো দিতে আসে।

পাহাড়ি পথে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই সামনে একটা বিশাল খালি চত্বরওয়ালা রেস্টুরেন্ট দেখেই কিছু খেয়ে নেয়ার জন্য ভেতরে প্রবেশ করলাম। রেস্টুরেন্ট চত্বরে কয়েকটা রঙিন ছাতার নিচে প্লাস্টিকের চেয়ার পাতা। তবে কোনোটাই খালি নেই। কোণার দিকে একটা ছাতার নিচের চারখানা চেয়ারের একটিতে এক বৃদ্ধা বসে আছেন। একটু দূরেই মাথায় পাগড়ি বাধা এক তরুণ শিখ দুটি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে ফুটবল নিয়ে লুফোলুফি করছে। দূরে পাহাড়ের সারি আর উপরে রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশ। এ রকম সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে রেস্টুরেন্টের ভেতরের আলো-আধারির মধ্যে প্রবেশ করতে মন চাইছিল না। এমন সময় বেয়ারা এসে বললো, ভেতরে বসতে না চাইলে ওই যে বৃদ্ধা মেম সাহেব ছাতার নিচে বসে আছেন ওখানের খালি চেয়ারে বসতে পারেন, আমাদের কাস্টমাররা শেয়ার করতে অভ্যস্ত।

খুশি মনে বেয়ারাকে স্যান্ডউইচ আর কফি আনতে বলে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে খালি চেয়ারে বসার অনুমতি চাইলাম।

তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।

স্যান্ডউইচ আর কফি এলো। আমি খেতে শুরু করলাম।

বৃদ্ধা রূপার পানদানি থেকে পান সুপারি বের করে সাজতে সাজতে ছোট ছেলেমেয়ে দুটোর বল খেলা দেখতে লাগলেন।

সিমলা অঞ্চলে পান খাওয়ার দৃশ্য বেশ বিরল। প্যাকেটজাত শুকনো পান-মসলা অনেকে খেলেও এখানে কাউকে চুন, সুপারি, জর্দা আর নানান মসলা দিয়ে পান সেজে খেতে সচরাচর দেখা যায় না। অন্যমনস্কভাবে বৃদ্ধার পান সাজা দেখছিলাম।

এটা লক্ষ্য করে তিনি বললেন, পান খাবেন নাকি।

বললাম, আসলে কি জানেন, পানের বাটা থেকে পান সেজে বাংলাদেশের দিদিমায়েরা অনেকেই খান। তবে এই সিমলায় কাউকে এভাবে খেতে দেখে বেশ অবাকই লাগছে।

বৃদ্ধা আমার দিকে একটা পান এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, বাংলাদেশ! আপনি বুঝি বাংলাদেশের লোক। এটুকু বলতে বলতেই তার উচ্ছ্বাস কেটে গেল। তিনি বিমর্ষ হয়ে পান চিবুতে চিবুতে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পাঞ্জাবি নারী-পুরুষরা পান খায় না। এভাবে পান খাওয়া বাংলাদেশে থাকাকালে আমি শিখেছি। ওখানে থাকাকালেই এক ঘটনায় আমার সংসার ভেঙে যায়।

আমি কৌতূহলী হলেও তা প্রকাশ করি না। তিনি আরেকখানা পান বানাতে বানাতে নিজ থেকেই বলতে থাকেন, আমার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী প্রায় পনেরো বছর আগে চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়কের নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে বাসা নিয়ে প্রজেক্টের সব ইঞ্জিনিয়ার পরিবার-পরিজনসহ বাস করতেন। আমি তখনই প্রথম বাংলাদেশে গিয়েছি। আমাদের বাসাটা ছিল সবার শেষে। তারপরই হিন্দুদের পাড়া শুরু হয়েছে। নাপিত, মিস্ত্রি এ জাতীয় নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র হিন্দুরা বসবাস করতো সেখানে। আমরা শিখ, জাতি-ভেদ নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমার এক মাত্র ছেলে সিমলার বোর্ডিং স্কুলে পড়তো। চট্টগ্রামে আমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের সংসার। দিনে

খুব একা লাগতো। দুটো হিন্দু মেয়েকে ঘরের কাজের জন্য রাখা হয়েছিল। তাদের সূত্র ধরে অনেক মেয়েই বাসায় আসতো। আমারও একা একা লাগতো বলে তারা এলে বেশ আদর-যত্নই করতাম। আস্তে আস্তে আমার স্বামীও তাদের সঙ্গে মিশতে শুরু করলো। বাংলা বলাটা রপ্ত করতে পারলে অফিসের কাজে সুবিধা হবে এই যুক্তি দেখিয়ে আমার স্বামী এক নাপিতের ডিগ্রি পড়ুয়া মেয়ে পরমা শীলকে রোজ সন্ধ্যা ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বাংলা শেখানোর জন্য নিয়োজিত করলো।

দিনগুলো চমৎকার কাটছিল। চিংড়ি মাছ, মাংস, সবজি সব বেজায় শস্তা ছিল। আমি সন্ধ্যায় ডিনার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকতাম। তাছাড়া রোজকার কাচাবাজার করতে ড্রাইভারকে নিয়ে মার্কেটেও যেতাম। আমার সর্দারজি রিডিংরুমে বসে পরমা শীলের কাছে বাংলা শিখতো। বাংলা ভাষাটা হিন্দির খুব কাছাকাছি হলেও হিন্দির চেয়ে অনেক মোলায়েম। মোলায়েম একটা ভাষা শিখতে গিয়ে বিশের কোঠার পরমা শীল আর পঞ্চাশের কোঠার সর্দারজি যে হাসাহাসি করতো তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখার কথা কখনো মনে হয়নি।

তবে আমার হুশ ফিরলো ইনডিয়া থেকে এক মাসের ছুটি কাটিয়ে চট্টগ্রামে আসার পর। ছুটিতে দিল্লিতে থাকার সময় নানান জিনিস কেনাকাটা করলাম। সর্দারজিও নিজের জন্য পোশাক-আশাক নানান রঙ-এর পাগড়ি কিনলো। ছুটি শেষে বাংলাদেশে আসার আগে গোছগাছ করতে গিয়ে সর্দারজির বৃফকেসের উপরের ডালার পকেটে শক্ত একটা বক্সের মতো কিছু একটা হাতে লাগলো। পকেট হাতিয়ে একটা লাল বক্স পেলাম। খুলে দেখি ছোট ছোট হীরা বসানো একখানা চমৎকার নেকলেস। নেকলেসটা নেড়েচেড়ে আবার সেখানেই রেখে দিলাম। আমার মনে হলো, কয়েকদিন পরেই আমাদের পচিশতম বিয়েবার্ষিকী। সর্দারজি নিশ্চয় সেদিন আমাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য এই চমৎকার নেকলেসখানা কিনেছে। মনে মনে সর্দারজির স্ত্রীপ্রীতিতে অত্যন্ত গর্বিত এবং খুশি হলাম ও নেকলেসের ব্যাপারে কিছু বললাম না।

বাংলাদেশে ফিরে এলাম। সর্দারজি আবার দিনে অফিস আর সন্ধ্যার পর পরমা শীলের কাছে বাংলা শেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমিও সারা দিন ঘরের কাজে সন্ধ্যাবেলা বাসা থেকে দূরে শহরের নানান প্রান্তের কাচাবাজার থেকে শস্তা টাটকা শাক-সবজি, মাংস এবং চিংড়ি মাছ কিনে এনে ডিনার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকলাম।

কিন্তু আমার রান্না-বান্না, ঘর-দুয়ার গুছিয়ে রাখার আনন্দের অবসান ঘটলো যেদিন সন্ধ্যাবেলা বাজার থেকে ফিরে পরমা শীলের গলায় সেই হীরের নেকলেসটাকে নানা রঙয়ের দ্যুতি ছড়াতে দেখলাম। সহসা বুঝতে পারলাম, এই শিখটা টাটকা সবজি, উত্তম মাছ, মাংস সংগ্রহের জন্য ড্রাইভারকে নিয়ে আমাকে দূরদূরান্তের বাজারে পাঠিয়ে রোজ সন্ধ্যায় দুই তিন ঘণ্টা ব্যস্ত রেখে বাংলা শেখার নামে পরমা শীলের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করে কাটিয়েছে!

যাক, পরমা শীলের সামনে মেজাজ খারাপ না করে তাকে বিদায় করে দিয়ে সর্দারজির মুখোশ উন্মোচন করতেই সর্দারজি ঝগড়া শুরু করে দিল। সে বলতে লাগলো, আমি নাকি ছোটলোকদের মতো তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। কয়েকদিন এ বিষয় নিয়ে সর্দারজির সঙ্গে ঠাণ্ডা সম্পর্ক চললো। কিন্তু তাকে পরমা শীলের পেছন থেকে কিছুতেই সরিয়ে আনতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম আমার সরলতার সুযোগে বুড়ো সর্দারজি ইতিমধ্যে নর মাংসভোজী বাঘে পরিণত হয়ে

গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের দিল্লি অফিসে ফোন করে আকার-ইঙ্গিতে ম্যানেজমেন্টকে বিষয়টা বুঝিয়ে তাদের সহযোগিতা চাইলাম।

পরদিন দিল্লি অফিসে থেকে ফ্যাক্স এলো শিখটার কাছে। ফ্যাক্সে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে তাকে দিল্লি হেড অফিসে যোগদানের জন্য বলা হয়েছে। যাহোক, দুই দিন পর দিল্লি পৌছালাম। ওখানে পৌছে অফিসে যোগদানের পর সর্দারজি ইমারজেন্সি বদলির কারণ বুঝতে পারলো। সে আমাকে অফিসে সম্মানহানির অভিযোগ তুলে মানসিক নির্যাতন শুরু করলো। তাছাড়া অল্প বয়সী তরুণী পরমা শীলের চক্কর তার তখনো কাটেনি। পরিস্থিতি এমন হলো যে, সর্দারজি আমার গায়ে হাত তুলতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত তাকে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হলাম।

এখন ছেলের সঙ্গেই থাকি। ওই যে আমার নাতি-নাতনি, ছেলে বল খেলে ফিরে আসছে। মাথায় লাল পাগড়ি পরা তরুণ টেবিলের কাছে আসতেই বৃদ্ধা তাকে বললেন, এই যে দেখো, ইনি বাংলাদেশের লোক, সিমলা এসেছেন বেড়াতে।

বাংলাদেশের নাম শুনেই তরুণটি কেমন যেন মুখ গোমড়া করে ফেললো।

এখানে থাক আর ভালো হবে না বুঝতে পেরে মেলের উদ্দেশ্যে আমি রওনা দিলাম।

বরিশাল থেকে

অনাকাঙ্ক্ষিত

– অনামিকা

আমার মনে হয়, যে পরিমাণ সম্পদ প্রবাসীদের থাকে তা খাটিয়েই নিজ দেশে থেকে সেই পরিমাণ টাকা অর্জন করা সম্ভব। একজন লোক যে টাকা ব্যয় করে দেশ ছাড়ে সেই টাকাই যদি সে নিজ দেশে খাটায় তবে তার অবস্থা খারাপ হবার কথা নয়। অন্য দেশে গিয়ে পরের গোলামি করে টাকা অর্জনের চেয়ে নিজ দেশে পরিশ্রম করে টাকা অর্জন করা অধিক সম্মানজনক। নিজ দেশে থেকে দেশের প্রতিও শ্রদ্ধা থাকে, সেই সঙ্গে পরের গোলামি না করে নিজ প্রচেষ্টাও বড় হওয়া যায়।

বিদেশে থাকা অবস্থায় একজন লোক যে পরিশ্রম বা যে ধরনের ছোট কাজ করে তা দেশে থেকে করলে সম্মান কোনো সময় কমে না।

যারা বিদেশে আছেন বা যারা যেতে চাচ্ছেন তারা কি স্বার্থে যেতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারি না। আপনাদের পরিচিত লোক, যারা প্রবাসী তাদের কথা একটু চিন্তা করে দেখুন। কি নিয়ে তারা বিদেশে যাচ্ছে আর কি হয়ে দেশে ফিরছে। দেখতে পাবেন, সহায়-সম্বল যা ছিল সব উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছে এবং ফিরছেও কেউ ফকির হয়ে, কেউ বড়জোর আট দশ লাখ টাকার মালিক হয়ে।

যারা ফকির হয়ে আসছে তারা তো সত্যিকার ফকিরেই পরিণত হচ্ছে। আর যারা কিছু টাকা নিয়ে আসছে তাদের এই প্রাণহীন, রসহীন, প্রীতিহীন টাকা নিয়েও বেশি দিন সুখে থাকতে পাচ্ছে না। দুই তিন বছর হয়তো বা বেশ ভালোভাবেই কাটায়। তারপর শুরু হয় আবার আগের জীবন।

সম্প্রতি আমার দেখা চারজন লোকের প্রবাস জীবনের কথাই সংক্ষিপ্তভাবে লেখা যাক।

এক. দূরসম্পর্কীয় এক মামা ডিগ্রি পাসের পর ঠিক করলেন তিনি বিদেশে যাবেন। দুই লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে গেলেন। সেখানে পৌছানোর পর গ্রামের বাড়িতে চিঠি এলো যে, তিনি যে ধরনের

চাকরির চুক্তি করে বিদেশে গিয়েছিলেন আসলে সেটা সত্যি নয়। তার কাজ খুবই নিম্নমানের। কাজেই যদি তিনি ভালো কাজ পান। তবে সেখানে থাকবেন নয়তো দেশে ফেরত আসবেন। শেষে দেখা গেল কোনো ভালো কাজ না পেয়ে দেশে ফেরত এলেন। দেশে দুই বছর বেকার থেকে এখন স্থানীয় একটা মাদ্রাসায় ঢুকেছেন।

দুই. আমার পরিচিত এক স্যারের ছেলে এইচএসসি পাসের পর এক লোককে বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকা দিলেন দেড় লাখ। কিন্তু দেখা গেল যেদিন ওনার ফ্লাইট সেই দিন পর্যন্ত কোনো জরুরি কাগজপত্রই হাতে পৌছলো না। কাজেই আর বিদেশ যাওয়া হলো না। এখন সেটারই খেসারত দিতে হচ্ছে মনে হয় হালের গরু টেনে।

তিন. এক প্রতিবেশী এসএসসি পাসের পর জমি বিক্রি করে দুই লাখ খরচ করে গেলেন বিদেশে। দীর্ঘ পাচ বছর ঝাড়ুদারের কাজ করে বানিয়ে নিয়ে এলেন লাখ পাচেকের মতো টাকা। এখন গত দুই বছর যাবৎ বসে বসে খাচ্ছেন। হয়তো বা বড়জোর আরো দুই বছর এভাবে চলবে। তারপর কি করবেন সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

চার. আমার এক কাজিনের হাজব্যান্ড বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পর বিদেশে পাড়ি জমালেন। দেশে রেখে গেলেন সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। কিছুদিন পর স্ত্রীর কোল জুড়ে এলো বাচ্চা। আর কাজিনের স্বামী মাঝে মধ্যে চিঠি পাঠাচ্ছেন স্ত্রীর কাছে। এবং চিঠিতে অবর্ণনীয় কষ্ট এবং প্রিয়জনদের না দেখার বেদনার কথা লিখে ইতি টানছেন, পাঠাচ্ছেন না কোনো টাকা। কারণ যে পরিমাণ টাকা অর্জন করেন তা দিয়ে নিজের পেটটা শুধু চালানো সম্ভব হচ্ছে। এবং নিজ সন্তানকে না দেখার ব্যাকুলতা নিয়ে কাটাচ্ছেন, বিভীষিকাময় প্রবাস জীবন।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নিম্নমানের কাজ, প্রতারকের পাল্লায় পড়া, ফিরে এসে বেকার জীবন এবং দূর থেকে আত্মীয়-স্বজনদের না দেখার বঞ্চনা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রবাস জীবন যাপনে উৎসাহী ভাইয়েরা নিশ্চয় আনন্দের সঙ্গে দেখবেন না। তাই যদি হয় তবে কেন আপনারা নিজ দেশে থেকে গতিশীল না হয়ে অন্য দেশে গিয়ে স্থিতিশীল হচ্ছেন? প্লিজ, একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন কি?

ময়মনসিংহ থেকে

বাহরেইনের পাচালি

– মোহাম্মদ সাজ্জাদ এইচ ভূঁইয়া

কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি চাকরি করার জন্য দেশ ছাড়তে হবে। সব সময় নিজের ওপর একটা বিশ্বাস ছিল, নিজের যোগ্যতায় দেশেই স্বাবলম্বী হতে পারবো। কিন্তু যখন ডিগ্রি পাস করার পাচ বছর পরও ভালো একটা চাকরি বা ব্যবসায় দাড়াতে পারলাম না তখন নিজের বিশ্বাসে ফাটল ধরলো। আত্মীয়স্বজনের তাড়নায় বাধ্য হলাম প্রবাস জীবন নিতে। বর্তমানে আমি বাহরেইনে।

বাহরেইন আসার ব্যাপারে প্রথমেই বাধা হয়ে দাড়ালো আমার নাম। কারণ আমার নাম মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া। বাহরেইন প্রবাসী আমার কাকার মাধ্যমে জানতে পারলাম হোসেন নাকি শিয়াদের নাম। বাহরেইনে সুন্নি ক্ষমতায়, সুতরাং এই নামে ভিসা হবে না। বাধ্য হলাম আমার

নামটাকে সাইজ করতে। মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া হয়ে গেলাম মোহাম্মদ সাজ্জাদ এইচ ভূঁইয়া। এ নামেই পাসপোর্ট হলো। ভিসা হলো।

আসার পরই শুরু হলো চাকরি খোজার পালা। যেহেতু মাস্টার্স পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি এবং কমপিউটারও মোটামুটি জানি সেহেতু এক পরিচিতজন ও কাকার সহায়তায় নিজের যোগ্যতায় জিজ্ঞ একচেঞ্জ কম্পানিতে ফরেন একচেঞ্জ ডিলার হিসেবে চাকরি পেয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে দুটি ঈদ চলে গেল। আমার এই ২৮ বছর বয়সে এই দুটি ঈদ করলাম আমার পরিবারের বাইরে। এটা যে কতোটা কষ্টের তা ভুক্তভোগী মাত্র জানে। এরপরও পত্রিকার পাতায় যখন দেখি প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের সুবাদে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভালো অবস্থায় আছে তখন গর্বে বুকটা ভরে যায় দুটি কারণে। *এক.* আমিও একজন রেমিটান্স প্রেরণকারী, *দুই.* বাহরেইন থেকে বাংলাদেশে আমাদের একচেঞ্জের মাধ্যমেই পাঠানো হয় সর্বাধিক রেমিটান্স।

রফা, বাহরেইন থেকে

নাজমুন্নেছা লুগনা

একদিন টিভিতে একটা নাটকে দেখলাম টেলিফোনে বিয়ে হচ্ছে বিদেশ থাকা একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের। পরদিন কলেজে গিয়ে বান্ধবীদের নিয়ে খুব হাসাহাসি করলাম, টেলিফোনের মাধ্যমে আবার বিয়ে হয় নাকি? এটা কি কাজি অফিস? ইত্যাদি। কিন্তু তখন কে জানতো এই হাস্যকর ব্যাপারটাই আমার জীবনে ঘটবে। তখন সবেমাত্র বিএ ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলাম। ক্লাসও করলাম কয়েকদিন।

ছোট চাচাকে আমার বাবার মতোই শ্রদ্ধা করি। তিনিও আমাদের ভাইবোনদেরকে স্নেহ করেন। একদিন এসে বললেন, লুগনা, তোর একটা ছবি দেতো।

এ বয়সে ছবি নেয়া-দেয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই মিথ্যা করে বললাম, আমার তো কোনো ছবি নেই।

পরে কিভাবে যেন ছবি সংগ্রহ করলেন।

কৌতূহল ততোটা ছিল না। তারপরও ছোট চাচিকে বললাম, ছবির কেন প্রয়োজন হলো?

উত্তরে চাচি যা বললেন তার সারমর্শ এই, আমার বড় ফুপুর ননদের ছেলে মা-বাবাসহ আমেরিকা প্রবাসী। ফুপুও তাদের কখনো দেখেননি। তারা আমাদের এখানে কখনো আসেন নি।

উল্লেখ্য, আমরা এক দ্বীপের বাসিন্দা আর তারা অন্য দ্বীপের। ছেলেটার কাছে ছবি গেল। অতঃপর পছন্দ হলো। অথচ সবই আমার অগোচরে। দেখতে আমি অপূর্ব সুন্দরী না হলেও চোখে পড়ার মতো।

একদিন হঠাৎ শুনলাম ছেলেপক্ষ আমাকে দেখতে আসবে। তাই চাচার বাসায় যেতে হবে। আমার মা-বাবা বিদেশ থাকা ছেলের ঘোর বিরোধী। আমি তো আরো বেশি। আমার মনে হতো, তাদের জন্মটাই সার্থক হলো না। সারাটা জীবন বিদেশ পড়ে থাকা! এটা আবার কেমন জীবন!

বাবা মায়ের পছন্দ হবে না সেই ভরসা পেলাম। স্রেফ কথা রাখতে গিয়ে তো হতবাক। ছেলের বড় বোন, ভাবী এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে। এক পর্যায়ে তারা আমার গলায় সোনার হার পরিয়ে দিলেন। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কথা ছিল স্রেফ দেখবে। আমার বোনকে বললাম, কি হচ্ছে এসব।
বোন আশ্বাস দিলেন ছোট চাচা ভুল করছেন না।

তখন মনের মধ্যে আর অতো সব প্রশ্ন জাগেনি কি হচ্ছে? কার সঙ্গেই জোড়া লাগানো হচ্ছে। নিজ বাসায় যখন এলাম তখন বুঝলাম, এনগেজমেন্ট হওয়া মানে অনেক বড় কিছু, বিয়ের শামিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম। বিদেশের ঘোর বিরোধী আমার মা-বাবা রাজি হয়ে গেলেন। শেষ ভরসা প্রিয় দুলাভাই? ওনাকে কেদে সব জানালাম। শুধু তিনি আমাকে বুঝলেন এবং সবাইকে বললেন। এ যুগে এসেও একটা অচেনা অজানা কোথাকার ছেলেকে বিয়ে করতে হবে। শেষে দুলাভাইকেও সবাই ভুল বুঝতে লাগলেন।

দুলাভাই বললেন, আমি নিরুপায়, সব মেনে নাও।

প্রতিবাদ করতে পারছি না। আমাদের পরিবার কড়া রক্ষণশীলতায় ভরা। এখানে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তোলে তবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। আমার অনিচ্ছায় মাত্র এক মাসের মাথায় টেলিফোনে বিয়ে হয়ে গেল। একা একা বৌ সাজানো বর ছাড়া। তখন পর্যন্ত লোকটার একটা ছবিও আমার দেখা হলো না। বিয়ে হলো ওদের বাসায়। সে রাতে আমাকে রেখে দিল, বর ফোন করলো। দুঃখ প্রকাশ করলো এভাবে বিয়ে হওয়ার জন্য। আমার মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল অজানা আশংকায়। এমন তাড়াহুড়ো করে বিয়ে কেন? তবে কি ছেলেটার কোনো কঠিন সমস্যা কিংবা শারীরিকভাবে...।

নিজেদের বাড়িতে এসে তার ছবি দেখলাম। দুটিই হাফ ছবি। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো খোড়া না তো। পায়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে। নানান ধরনের প্রশ্ন নিয়েই আছি। কিন্তু কোনো সমাধান মিলছে না। এদিকে আত্মীয়দের মধ্যে দুই ভাগ হয়ে গেল। কেউ বললো, ছেলের শিক্ষা নেই। যে যাই বলে বিশ্বাস হচ্ছে।

বিয়ের আগে একজনকে পছন্দ করতাম। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। তাকে খুবই পছন্দ করতাম। তবে তাকে বুঝতে দিতাম না। হ্যাংলাপনা আমার ভালো লাগে না। আর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেও আমাকে পছন্দ করতো। তাই ভাবলাম বিএ পরীক্ষার পর দুলাভাইকে ব্যাপারটা জানাবো। আমার একমাত্র দুলাভাই, তিনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন। সে আর বলা হলো না। আমার স্বামী অর্থাৎ তমাল-এর সঙ্গে বেশ কয়েকবার টেলিফোনে আলাপ হয়েছে তাদের ওখানে। বিয়ের পর স্বামী ছাড়া শ্বশুরপক্ষের লোকদের সঙ্গে থাকতে হয়েছে। অচেনা জগৎ ভয়ে কুকড়ে যেতাম। তবুও তাদেরকে বোঝাতাম না। টেলিফোনে তমালের বেশির ভাগ কথায় হ্যা, না বলে উত্তর দিতাম।

এক সময় পড়াশোনার দোহাই দিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। কিছুদিন পরে তার একটা চিঠি পেলাম। এই প্রথম চিঠি পড়ার শুরুতেই বিরাট ধাক্কা খেলাম। সে আমার সঠিক নামটাও জানে না। অনেকক্ষণ সবার অজান্তে কাদলাম। ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে তাকে সঠিক নামটা জানানো হলো। আমার বিয়ের ব্যাপারটা বান্ধবীরাও জানতো না। কেউ প্রশ্ন করলে ফালতু কথা বলে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন হঠাৎ করে ভাসুর এসে হাজির। বললেন, তমাল আসছে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১–এ। আমাকে যেতে হবে। বাবা মা বাক্য ব্যয় না করে পাঠিয়ে দিলেন। মাকে ধরে ভীষণ কাদলাম। আমার বুঝি আর বৌ সাজা হলো না, হলো না সাধের গায়ে হলুদও। সে যেদিন এলো সেদিন ছিল হরতালের দিন। আমাকে সবাই মিলে সাজিয়ে দিল। এয়ারপোর্টে গিয়ে অচেনা স্বামীকে বরণ করে আনার জন্য। রিকশা করে গেলাম হাতে লাল গোলাপ নিয়ে। তমাল এলো, হাতে ফুল ধুরিয়ে দিলাম অন্যদিকে তাকিয়ে। কারো মুখে কথা নেই, আড়চোখে একবার তাকালাম। সুন্দরই বটে। ছয় ফিট উচ্চতার লোকটি আমার হাতে কাগজে কাটা ফুলের মতো কার্ড ধরিয়ে দিল।

স্বামীর সঙ্গে আমার দিন কাটছে। কিন্তু তাকে কিছুতেই মনের মধ্যে স্থান দিতে পারছি না। বার বার কেমন যেন অচেনা মনে হয়। অথচ তমালের আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। সব কিছুতেই আমার সঙ্গে শেয়ার করতো। তবে আমি পারছি না। কাউকে বোঝাতামও না। সবার সামনে এক আচরণ আবার সবার অজান্তে অন্য রকম। সে আমাকে তার অতীত, বর্তমান সবই বললো। বুঝলাম তার জীবনে আমি প্রথম নারী নই। এদিক থেকে আমিও বলবো, সেও আমার জীবনে প্রথম পুরুষ নয়। কারণ বিয়ের আগে যাকে পছন্দ করতাম সে সময় তাকে আমি বর্তমানের প্রেমিক এবং ভবিষ্যতের স্বামী বলে জানতাম। তার কথাও তমালকে বললাম। তবে সব না।

এক মাস পরে যখন মায়ের কাছে এলাম তখন সবার চোখ ফাকি দিলেও মায়ের চোখে ফাকি দিতে পারলাম না। তিনি কিভাবে যেন টের পেলেন। আপুকে বললেন, আমাকে বোঝানোর জন্য।

আমি যে স্বাভাবিক হতে পারছি না। তমাল অনেক দম্পতিদের দিয়ে আমাকে উদাহরণ দিতো। বলতো, দেখো তাদের সম্পর্ক কতো ভালো।

সবই আমার এ কান দিয়ে ঢোকে, অন্য কান দিয়ে বের হয়।

একদিন এসে বললো, আমার যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমাকে বিশ্বাস করানোর জন্য হাতের কাগজপত্রগুলো দেখালো।

অথচ আমি প্রতিক্রিয়াহীন।

বললো, শেষ কয়েকদিনে তুমি আমার সঙ্গে আন্তরিক হতে পারছো না।

চুপ হয়ে থাকলাম। এক সময় আবিষ্কার করলাম তার চোখে পানি।

জিজ্ঞাসা করতেই হাউ মাউ করে কেদে দিল। বললো, আমি কিভাবে থাকবো তোমাকে ছাড়া।

এই প্রথম কোনো পুরুষ মানুষকে এমন করে কাদতে দেখলাম। তাও আমার জন্য। অথচ কোনো অনুভূতি হলো না। তারপরও শেষ কয়টা দিন তার সঙ্গে আপন হতে চাইলাম। কিন্তু লজ্জা, সংকোচ ইত্যাদির কারণে পারলাম না। জুলাই মাসের ২০ তারিখে সে চলে যাবে। ১৮ জুলাই তার এক বন্ধুর চায়নিজ খাবারের আমন্ত্রণে গেলাম তারই সঙ্গে।

সেই প্রথম আমার অনুভূতিতে টনক নড়ে। হঠাৎ করেই আমি আনমনা হয়ে গেলাম। মনে হতে লাগলো, এই বুঝি তার সঙ্গে আমার শেষ বের হওয়া। তারপরে দীর্ঘ বিচ্ছেদ। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তখনই মনে হতো লাগলো, আমি কি তমালকে ভালোবেসে ফেলেছি! তা না হলে এমন লাগছে কেন? বাসায় এলাম। সারা পথে কোনো কথা বললাম না।

সে বুঝতে পারলো। তাই নিজেও বাক্য ব্যয় করলো না। বাসায় ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলো, কি হলো তোমার?

সঙ্গে সঙ্গে আমি কেদে দিলাম। ভীষণ কাদছি। তার শত সান্ত্বনা আমার কানে যাচ্ছে না। সেও কাদলো। শেষ দুই দিন আমি ছিলাম অন্য রকম মানুষ। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত।

অবশেষে ২৬ জুলাই বিদায় মুহূর্ত। অথচ তাকে আমি বিদায় দিতে পারিনি এয়ারপোর্টে। শব্দহীন চোখে পানি তার কোনো কথায় আমার কানে গেল না। অতঃপর সে চলে গেল। আমেরিকাতে বিমান হামলার কারণে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে তাদের। যার কারণে আমাকে নিতে পারছে না এবং সেও আসতে পারছে না আজ প্রায় দেড় বছরেরও বেশি। প্রতিদিন ফোন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে। সে থাকা অবস্থায় আমার কৃতকর্মের জন্য এখন আমাকে কথা দিয়ে জর্জরিত করে।

তমাল যখন দেশে ছিল তখন তার অনেক কিছুই আমার সহ্য হতো না। যেমন অতিরিক্ত চঞ্চলতা, অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়া। অথচ তার এসব ত্রুটিগুলো এখন আমার মনেই পড়ে না। এতো দূরে থাকা সত্ত্বেও আমার সব ব্যাপারে তার সজাগ দৃষ্টি।

এর মধ্যে বিএ পাস করে ফেললাম। তার অতি উৎসাহেও পড়ায় এগোতে পারলাম না। ভালো লাগছে না। সে জন্য মাঝে মধ্যে নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয়। তাকে আমি সবদিক থেকে জ্বালাচ্ছি। আমার জন্য তার অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। তবুও নিতে পারছে না। তার প্রতি আমার বিশেষ ক্ষোভও আছে। সে আমাকে ঈদে এবং বিয়েবার্ষিকীগুলোতে উইশ করে না। কিন্তু উপহার সামগ্রী পাঠায়।

তমাল, যায়যায়দিনের মাধ্যমে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি দীর্ঘ চার মাস বাইশ দিনে আমার করা সবগুলো অপরাধের জন্য। আর যে কথা মুখে বলা হয়নি – তমাল, আই লাভ ইউ ফরএভার।

চট্টগ্রাম থেকে

রীতিনীতি

প্রথম বিদেশের মাটিতে পা রাখি ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে। চারদিকে বরফে ছেয়ে থাকা দেশটিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বিদেশে এসে প্রথমে যে অভিজ্ঞতাটি হলো তা যেমন বিব্রতকর আবার হাস্যকরও বটে। সেটা হলো, ইংরেজি শব্দ চয়নে। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে, *কানাকে কানা বলিও না।* কিন্তু এই দেশে যে এই প্রবাদের মর্মকথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় তা বুঝতে পারিনি।

এখানে আসার পর বাসায় নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিস দরকার হলো স্বাভাবিকভাবে। নতুন কিনতে গেলে অনেক দাম পড়বে। তাই একজনের পরামর্শে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলার কাছ থেকে পুরনো জিনিস কিনতে গেলাম। এই শ্বেতাঙ্গ মহিলা পুরনো জিনিস কম দামে কিন্তু ভালো জিনিস বিক্রি করেন। আমার পরামর্শদাতা বলে দিয়েছিলেন, অমুক ঠিকানায় এক বুড়ি আছেন। তুমি তার কাছ থেকে শস্তায় পুরনো ভালো জিনিস পাবে।

আমি বড় ভাইয়ের কথা মতো ওই বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, পুরনো জিনিস বিক্রি করেন এমন কোনো বৃদ্ধা এখানে আছেন কি?

ব্যস, আর যাই কোথায়! মহিলা তেড়ে এসে বলে, Do I look old? আমাকে কি বৃদ্ধা মনে হয়? পাঠক, বুঝুন ঠেলা। তৃতীয় দিনের প্রবাস জীবনে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার সামনে নাকাল হচ্ছি। তাকে এখন কিভাবে বোঝাই। পরে বুদ্ধি করে বললাম, দেখো, আমি তো এখানে নতুন, আমাকে এক পথচারী বলে দিয়েছিল যে, এখানে এক বৃদ্ধা পুরনো আসবাবপত্রের ব্যবসা করেন। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

তখন ওই মহিলা একটু নরম হয়ে বললো, Next time you see that man, do me a favour. punch him on his nose! পরের বার আমি ওই লোককে দেখে নেবো। তুমি আমার জন্য একটা কাজ করো, তার নাকে এক ঘুসি বসিয়ে দিও!

পরে ধীরে ধীরে বুঝলাম, এখানে বয়স্ক লোকদের সিনিয়র বলার প্রচলন। ওল্ড শব্দটি মানুষের জন্য অপমানসূচক!

বিদেশে আমাদের রক্ষণশীল দেশের ছেলেমেয়েদের যে সমস্যা প্রথম হয় তা হচ্ছে, কালচারাল শক। আমাদের কাছে পশ্চিমি বিশ্ব বলতে শুধু হলিউড থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা যা থেকে আমাদের অনেকেরই ধারণা হয়, পশ্চিমা বিশ্বের ছেলেমেয়েরা সম্ভবত অবাধ যৌনতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে স্বর্গ সুখে আছে। আমার চিন্তাও তেমন ব্যতিক্রম ছিল না। তাছাড়া এসেছি যখন মাত্র একুশ বছর বয়সে, চোখে মেয়েদের নিয়ে রঙিন স্বপ্ন। মাথায় সারাক্ষণই গার্লফ্রেন্ড জোটানোর চিন্তা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে শিখলাম যে, এ দেশেও রয়েছে সমাজ ব্যবস্থা, রয়েছে সামাজিক রীতি–নীতি। যদিও তা আমাদের দেশের মতো কঠোর নয় বা মানতে বাধ্য করা হয় না তবুও কেউ তা ভঙ্গ করলে তাকে খারাপ চোখে এ দেশেও দেখা হয়। আমাদের দেশে তরুণ–তরুণীরা সব সময়ই একটা কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তা হলো, পশ্চিমা বিশ্ব কনজার্ভেটিভ নয়। বাংলাদেশের পাঠক পাঠিকারা, বিশেষ করে মেয়েরা হয়তো বলবেন, বিদেশে মেয়েদের অনেক স্বাধীনতা, মেয়েরা খোলামেলা পোশাক পরে বের হলেও তাদের সামাজিকভাবে হেয় করা হয় না।

এ কথা সত্যি, এ দেশে তা করা হয় না। কারণ এ দেশের মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু বিশ্বাস করুন আর না করুন, যেসব মেয়ে অতিরিক্ত খোলামেলা পোশাক পরে চলাফেরা করে তাদেরকে এ দেশের ছেলেরা আড়ালে *বিচ* বলে সম্বোধন করে। তবে এ কথা সত্যি, পশ্চিমা নারী ও পুরুষ সমঅধিকারে বিশ্বাসী। আমাদের যা পুরুষরা জোর করে বাধ্য করে নারীদের এখানে তা বর্বরতার শামিল। কারণ তারা এখানে শুধু পুথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত না। নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য এবং অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষায়ও শিক্ষিত। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এ শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পোশাক

– হাসিনা করিম রত্না

চাকরি সূত্রে আমাকে প্রতি মাসেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেতে হতো। যখন স্কুলে পড়তাম তখন তসলিমা নাসরিনের কিছু বই পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, শুধু বাঙালি ছেলেরাই বুঝি মেয়েদের

উত্যক্ত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। কিন্তু যখন এই চাকরিটা করার সৌভাগ্য আমার হলো তখন ধীরে ধীরে এ ধারণা পাল্টে যেতে থাকলো। আমি যে খুব সুন্দরী সেটা দাবি করি না। তবে *প্রিয়জন* পত্রিকার ফটো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম।

দুবাই, রিয়াদ, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, লন্ডন যেখানেই শপিংয়ে বা ঘুরতে বের হতাম, কিছু না কিছু বিড়ম্বনার শিকার মাঝে মধ্যেই হতে হতো। বুদ্ধির কৌশলে, কখনো বা পুলিশের ভয় দেখিয়ে ঘটনাগুলো এড়িয়ে যেতে সক্ষম হতাম। মূল পার্থক্য এখানেই। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া ইওরোপ, আমেরিকাতে পুলিশ মানেই প্রিয় বন্ধু। আর যারা মেয়েদের দেখে উত্যক্ত করে তাদের বলার ধারণাটা ভদ্রোচিত।

একবার আমার এক আমেরিকা প্রবাসী বান্ধবীকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস-এ এক বড় শপিং মলে ঘুরছি কিছু পছন্দ হলে কিনবো বলে। আমি সালোয়ার কামিজ পরা পুরো বাঙালি রমণী। এসকেলেটর দিয়ে ওপরে উঠছি। অন্য এক আমেরিকান নিচে নামবে বলে পাশের সিড়িতে পা রেখে আবার দাড়িয়ে গেল। মানুষের যেমন স্বাভাবিক দৃষ্টি বিনিময় হয় তেমন হলো।

আমি উপরে উঠতেই সে বললো, হাই! ইউ আর ভেরি সেক্সি।

আমার তো রাগে মাথা গরম হয়ে গেল।

বললাম, হোয়াট ডিড ইউ সে স্টুপিড? আই উইল কল পুলিশ।

অবাক হচ্ছিলাম এতো শালীন একটা পোশাকে থাকা সত্ত্বেও সে কেন এই মন্তব্য করলো!

আমার বান্ধবীটি আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো আর লোকটিকে বললো, সরি।

আরো রেগে গিয়ে বললাম, এই তুই ওকে সরি বললি কেন?

ও বোঝালো, এই কথায় লোকটি নাকি আমাকে সুন্দরী বলেছে। তাছাড়া কোনো কিছু সুন্দর হলে তা বলাতে অন্যায়ের কিছু নেই বলে এরা মনে করে।

আমি চুপ মেরে গেলাম।

শপিং মলে ঘুরছি। কিছু কেনাকাটা শেষ করে কিউতে দাড়ালাম দাম পরিশোধের জন্য। যে মহিলা টাকা নিচ্ছে তার পাশে ছয় ফিট লম্বা দৈত্য সাইজের এক কালো-মোটা মহিলা ছিল। সম্ভবত কিছু দেখছিল, সে আমার বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করলো (আমাকে দেখিয়ে) হু ইজ শি?

ও বললো, মাই ফ্রেন্ড।

সে বললো, উইল শি ওয়ার্ক হিয়ার?

বান্ধবী বললো, নো ম্যাম, সরি।

১১ সেপ্টেম্বরের সকালে যখন টুইন টাওয়ার সন্ত্রাসী হামলা হলো তখন আমি ছিলাম সিংগাপুর থেকে ঢাকার পথে। এখানে তখন রাত। সহকর্মীদের কাছে খবর শুনে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। টিভিতে দেখার পর ও মনে হচ্ছিল, এ কি করে সম্ভব!

যা হোক, এই ঘটনার কিছুদিন পরই সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমাকে আবার পাড়ি জমাতে হলো আমেরিকাতে। অফিস থেকে প্রচুর বৃফিং দেয়া হলো। আইডি কার্ড ছাড়া যেন বাইরে না যাই, অকারণে হোটেল থেকে যেন বের না হই ইত্যাদি।

ক্লান্তিতে গাড়িতে ঝিমুতে ঝিমুতে হোটেলে পৌছালাম। পৌছেই লাকীভাবীকে ফোন করলাম।

ভাবী ফোন পেয়ে ভীষণ চমকে উঠলেন। বললেন, এই সময় তুমি নিউ ইয়র্কে?

বললাম, কেন ভাবী, এতো ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। এ দেশ আর যাই হোক, অন্যায় ছাড়া কাউকে কিছু বলবে না।

ভাবী বললেন, সে তো আমিও জানি। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়।

সেটা কি?

তোমার পোশাক। তুমি অবশ্যই সালোয়ার কামিজে বাইরে বের হবে না।

বললাম, সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে সালোয়ার কামিজের সম্পর্ক কি?

তুমি এসো বাসায়, পরে বুঝিয়ে বলছি। টেলিফোনে সব বলা যাবে না।

পড়লাম মহাফ্যাসাদে। আমার কাছে তো অন্য কোনো পশ্চিমি পোশাক নেই। মনে পড়ে গেল শেখ সাদীর কথা। আমাকেও যে কখনো পোশাক নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে ভাবতে পারিনি।

জানালার পর্দাটা সরিয়ে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের বিল্ডিংটার দিকে তাকালাম। দেখি মানুষ মাত্র নেই। যেখানে রাত-দিন মানুষের হাট লেগে থাকে, কেউ ছোটে ট্রেন ধরতে, কেউ বা শপিংয়ে, কেউ বা রোমান্সে ব্যস্ত ইত্যাদি হাজারও দৃশ্য চোখে পড়তো। সেখানে আজ এতো নীরবতা! হঠাৎ ভয়ে কেমন গা শিউরে উঠলো। তখন মনে হলো, হোটেলের লবিতে এতো গাদাগাদি ভিড় লেগে থাকে, অথচ আজ কেউই তেমন ছিল না। তাহলে কি দশ বারোজন ছাড়া এতো বড় বিল্ডিংয়ে তেমন কেউ নেই। অসম্ভব! আমি এখানে থাকতে পারবো না।

সুটকেস লক করে, সালোয়ার কামিজ পরেই আইডি কার্ড গলায় ঝুলিয়ে প্রিয় যায়যায়দিনসহ অন্য কিছু পত্রিকা আর ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। লবিতে চাবিটা জমা দেয়ার সময় রিসেপশনে এক পাকিস্তানিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এতোটা জনমানবহীন কেন হোটেল এবং রাস্তাগুলো?

দেখলাম সেও খুব দুঃখিত এবং এর জন্য সন্ত্রাসী হামলাকেই দায়ী করলো। বললো, এই নিউ ইয়র্ক শহর পর্যটন কেন্দ্র। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষ এখানে আসে, থাকে, খায়, ঘোরে জিনিস কেনে। রেস্টুরেন্টগুলো প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সমমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ পর্যটক নেই।

990c-এর দোকানে দেখলাম ভিড় নেই। পাতালট্রেন ধরবো বলে রাস্তায় বের হলাম। ভাবীর কথা কানে বাজছিল। কিছুটা কৌতূহল এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাটতে থাকলাম বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর Macy's-এর পাশ দিয়ে। রাস্তায় নেমে নিচে যাবার রাস্তায় হাটতে থাকলাম। এক ডলার দিয়ে একটি পাতালট্রেনের টিকেট কিনলাম যা দেখতে ফুটো পয়সার মতো।

ট্রেন এলো। কামরা প্রায় খালি। অদূরে একজন বসে আছে। যায়যায়দিন খুলে বসলাম। কারণ গন্তব্যে পৌছাতে অর্থাৎ 79 STR, Jamaica-তে যেতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগবে। উল্লেখ্য, প্রতিবার দেশ ছাড়ার মুহূর্তে এয়ারপোর্টে পত্রিকার স্টল থেকে যায়যায়দিনের নতুন কপি নিতে ভুল করি না। কারণ অবসরে টিভির পাশাপাশি এটিও আমাকে বিনোদন দেয়।

পত্রিকার পাতায় একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কে একজন বলে উঠলো, আর ইউ ফ্রম ইনডিয়া?

নো, আই অ্যাম ফ্রম বাংলাদেশ।

সে বললো, আই সি, দ্যাটস হোয়াট আই অ্যাম থিংকিং। ইউ আর সো বিউটিফুল গার্ল।

বললাম, থ্যাংকস।

দেখি কামরার সেই লোকটি। ভেবেছিলাম এখানেই শেষ। তাই আবারও পত্রিকায় চোখ দিলাম। এবারও সে বলতে শুরু করলো।

আমি তো মহাবিরক্ত। এদিকে ট্রেন হঠাৎ হঠাৎ কোনো জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ থেমে আবার চলছে।

সে একে একে বলছে, আমি ইনডিয়ান। এখানে পড়াশোনা করি, পাশাপাশি কাজও করি। তোমার মতো সুইট লেডি পেলে বন্ধুত্ব করবো, এসব।

আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আমি বাগদত্তা। আমার স্বামী একজন বৈমানিক এবং আমি এ দেশে থাকি না।

সে অবাক হয়ে জানতে চাইলো, কেন থাকি না।

বললাম, আমার ভালো লাগে না বিদেশে থাকতে। বেড়াতে ভালোলাগে। তাছাড়া আমি চাকরি সূত্রে এখানে এসেছি।

সে বিশ্বাস করছে না আমার কথা। আমি কোথায় কাজ করি, কার সঙ্গে থাকি ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নে আমাকে মহাবিরক্ত করে ফেললো।

এক সময় রেগে গিয়ে বললাম, প্লিজ, ডোন্ট ডিসটার্ব মি, আই অ্যাম ভেরি টায়ার্ড।

কে শোনে কার কথা?

বিদেশে লেখাপড়া করা ইনডিয়ান ছেলে এতোটা বেহায়া হতে পারে ভাবতে পারিনি। ভাবীর কাছে গল্প শুনেছি, নিউ ইয়র্কে অনেক বাঙালির সংসার ভেঙেছে এই ইনডিয়ান এবং পাকিস্তানিদের জন্য। দেশে থেকে সুন্দরী মেধাবী মেয়েদের ট্যাকসি ড্রাইভার বা রেস্টুরেন্টে কিংবা অন্য কোথাও অড জব করা ছেলেরা বিয়ে করে নিয়ে যায়। এবং অ্যাডজাস্ট না হওয়াতে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটছে সেখানে।

যাই হোক। এক সময় গন্তব্যে পৌছালাম। সে আর আমার পিছু নেয়ার সাহস করেনি। কিছুটা হেটেই ভাইয়ার বাসা। চারদিকে চোখ বোলালাম, দেখলাম এখানে নীরবতা এতোটা নেই। সেভেনথ এভিনিউয়ে যেমন পুলিশের গাড়ির হর্ন এবং উল্লেখযোগা সংখ্যক সিকিউরিটির লোক ছিল, এখানে তেমনটা নেই। তবে আগের মতো এতো লোকও নেই। দুই ব্লক হেটে ভাইয়ার বাসায় পৌছালাম।

ভাবীকে ঘটনা বলতে ভাবী বললো, তুমি পুলিশকে ডাকোনি কেন?

আমার এই বাঙালি পোশাকের জন্য নিউ ইয়র্কে সে বছর যে কয়দিন ছিলাম তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। আমি মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই বাইরে ঘুরেছি।

যশোর থেকে

চুমু

– দিদারুল ইসলাম

সিঞ্চন সিউলের বেশ কয়েকটি ব্যস্ততম এলাকার একটি। চারটি ইউনিভার্সিটির সংযোগ হওয়াতে তরুণ, তরুণীদের ভিড় লেগেই থাকে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই ঢল যেন বাধ ভাঙা জোয়ারের রূপ ধারণ করে।

আমার কর্মস্থল এই সিঞ্চন। এখানকার এক প্রিন্টিং প্রেসে কাজ করি সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত। বাসা তো নয়, ফ্যাক্টরির ছাদে একটা টঙ আকৃতির ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা। বিশ পচিশজন শ্রমিকের মধ্যে আমিই একমাত্র বিদেশি। বাসা যাই হোক। সহশ্রমিকদের আন্তরিকতা, অন্য সুযোগ সুবিধা ভালো থাকায়, সর্বোপরি সিঞ্চনের এই আলো ঝলমলে রূপের কারণে এই চাকরিতে থেকে গেলাম।

গ্রীষ্মে যেন সন্ধ্যা নামতেই চায় না এই কোরিয়াতে। সূর্যের প্রখর উপস্থিতির কারণে সন্ধ্যা ছয়টাকে বিকেল তিনটা বলে মনে হয়। প্রতিদিন কাজ শেষ করে সহশ্রমিকদের সঙ্গে, কখনো বা একা বেরিয়ে পড়তাম এই রূপসী সিউলেরই আলো ঝলমলে সিঞ্চনের অলিতে-গলিতে। শত সহস্র মানুষের ঢলে আমিও একাকার হয়ে যেতাম।

হাজার মানুষের ভিড়ে থেকে ভুলে যেতাম প্রবাসের একাকীত্ব, ভুলে যেতাম পৃথিবীর দরিদ্রতম একটি দেশের নাগরিক আমি। শ শ প্রাণোচ্ছল তরুণ-তরুণীর মাঝে থেকে ভুলে যেতাম আমি ভাগ্যান্বেষণে আসা একজন সাধারণ বিদেশি শ্রমিক।

কখনো বা রাস্তার পাশের চার তলার কফি শপ বসে মানুষের এই ব্যস্ততা দেখতাম নীরবে। তেমনি একদিন কফি শপে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তার দিকে মুখ করে বিশাল এই জনতার ব্যস্ততা দেখছিলাম, দেখছিলাম হাজার মানুষের পথচলা।

হঠাৎ একটি কোরিয়ান তরুণী এসে বললো, *সিলা হামনিদা, না ইঅগি আন-জ তো খেনছানা?* অর্থাৎ বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, আমি এখানে বসলে কোনো অসুবিধা হবে কি?

বললাম, বসুন, কোনো অসুবিধা নেই।

এতোক্ষণে খেয়াল করলাম কফি শপে লোকজন খুব বেশি নেই।

মেয়েটি বললো, আমি এতোক্ষণ তোমার পেছনের সিটে ছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে দেখছি তুমি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছো। তোমার কি মন খারাপ? তোমার কি দেশের কারো কথা মনে পড়ছে? তোমার দেশ কোথায়? এখানে কোথায় থাকো, কি করো ইত্যাদি।

আমিও তার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তার নাম কিম মিয়ং সুক পাশের গ্র্যান্ড মার্ট মার্কেটে কাজ করে। এখানে তার বান্ধবী আসার কথা ছিল। অপেক্ষাই থেকে থেকে আমার দিকে তার চোখ পড়েছে, আমি আনমনে তাকিয়ে কি যেন ভাবছি। তাই আমার পাশে আসা।

বললাম, আমি মাঝে মধ্যে এই কফি শপে এসে জানালার পাশে বসে মানুষের ব্যস্ততা দেখি।

ইতিমধ্যে সে আরেকবার কফির অর্ডার দিয়েছে। জানতে চাইলো আমি গান গাইতে পারি কি না। নুরে বাংয়ে যাবো কি না। নুরে শব্দের অর্থ হলো গান এবং বাং হলো রুম। কোরিয়ার প্রত্যেক জায়গায় নুরে বাং আছে। ওখানে ছোট ছোট রুমে নাম্বার দেয়া গানের তালিকা, টিভি, মাইক্রোফোন, বিশেষ যন্ত্র আছে। পছন্দ মতো গান বেছে ওই নাম্বারটা যন্ত্রে টিপলেই টিভি পর্দায় গানের কথাগুলো ভেসে ওঠে এবং ওই গানের মিউজিক বাজতে থাকে। গান না জানা ব্যক্তিও টিভি পর্দায় দেখে গান গাইতে পারে।

কোরিয়ান আবালবৃদ্ধবনিতা দল বেধে এই নুরে বাংয়ে গিয়ে গান গায়।

বললাম, গান আমি ভালো গাইতে পারি না।

সে বললো, তাহলে চলো, ভিডিও বাংয়ে গিয়ে সিনেমা দেখবো। ভিডিও বাংও নুরে বাংয়ের মতোই। তবে এখানে একটা নিয়ন্ত্রণ রুম আছে। নিয়ন্ত্রণ রুম থেকে প্রতিটি রুমের ভিডিও নিয়ন্ত্রিত হয়। পছন্দ মতো সিনেমার নাম বলে বিল পরিশোধ করে নির্ধারিত রুমে গিয়ে বসলেই সিনেমা শুরু হয়।

প্রয়োজনে ডাকা ছাড়া ছবি শেষ হওয়ার আগে কেউ সাধারণত রুমে আসে না। এর আগে নুরে বাংয়ে বেশ কয়েকবার যাওয়া হলেও ভিডিও বাংয়ে যাওয়ার জন্য রাজি হলাম।

কি সিনেমা দেখবো। সেটা তার পছন্দের ওপর ছেড়ে দিলাম। কেননা তার ইচ্ছাতেই ভিডিও বাংয়ে আসা। তারপর বিলটা পরিশোধ করে নির্ধারিত রুমে গিয়ে বসলাম। সিনেমা চলতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে আমরা ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। মিয়ং সুকসী না ডেকে মিয়ং সুকি ডাকার জন্য বললো। আমিও তাকে সি না ডাকার জন্য বললাম।

কোরিয়ানরা নামের শেষ *সি* এবং জাপানিরা নামের শেষে *সান* যোগ করে সম্মান দেখিয়ে থাকে। সি এবং সান-এর বাংলা হলো সাহেব। তারা আমাদের বাঙালি নামগুলো ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারে না। ফলে আমাদের নামের সঙ্গে কখনো সংযোজন, কখনো বা আরো কিছু অক্ষর যোগ করে তাদের নিজস্ব ঢংয়ে ডাকতে থাকে। যেমন কামরুলকে *কামারু,* ফারুককে *ফারা,* নবীকে *নবীআ* বলে ডাকে।

ভিডিও বাংয়ে সাধারণত একটা সোফা থাকে। তাতে দুইজন বসা যায়। সিনেমা ছিল একটা একশনধর্মী। সিনেমা চলছে, আমরাও পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখছি, এটা-সেটা নিয়ে গল্প করছি। পাশাপাশি বসার কারণে তার শরীরের স্পর্শ পাচ্ছি। তার পারফিউমের গন্ধে ছোট এই কুঠুরিটা ভুরু ভুরু করছে।

কার ইচ্ছাই জানি না, কথা বলতে বলতে আমরা আরো কাছাকাছি হলাম। আমি বললাম, মেয়েদের চুল আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। আমি তার হেয়ার স্টাইলের প্রশংসা করে মাথায় হাত দিয়ে চুলের গন্ধ শুকে হালকা একটু আদর করলাম।

মনে হলো সে আরো আদর চায়। সে চুলগুলো নামিয়ে আনলো তার আর আমার মুখের মাঝখানে। এবার আমি আরোও বেশি করে তার চুলের গন্ধ নিলাম।

হঠাৎ সে নিবিড়ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। আমিও ক্ষণকাল বিলম্ব না করে প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করিনি। এভাবে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। কেননা সংবিৎ ফিরে পেলাম বেয়ারার ডাকে, *ছুন নিম, ইয়াংহা কথনাছ মিদা।* অর্থাৎ জনাব, সিনেমা শেষ হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

চিবাকেন, জাপান থেকে

দুই নাম্বার স্ত্রী

– ঝর্না

ঘটনাটি আমার স্বামীর ছোট দুই ভাই অর্থাৎ আমার মেজ এবং ছোট দেবরকে নিয়ে। ছোট দেবর আমেরিকা গিয়েছে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে। নিউ ইয়র্কের একটা কলেজ থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং

পাস করে ভালো চাকরি করছে। মেজ দেবর টুরিস্ট ভিসায় গিয়ে আর ফিরে আসেনি। সোজা কথায় যাকে বলে অবৈধ ইমিগ্রান্ট। অবশ্য তার ওয়ার্ক পারমিট আছে।

১৯৯৬ সালের কথা। আমার শ্বশুর মৃত্যু শয্যায়। মেজ দেবর যেহেতু ১৯৮৮ সালের পর দেশে আসেনি তাই ল'ইয়ার ধরে কিভাবে যেন এক মাসের জন্য বাংলাদেশে এলো। সে আসার আগেই আমার শ্বশুর মারা গেলেন। এতো শোকের মাঝে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, সে যেহেতু আর আসতে পারবে না, সেহেতু তাকে বিয়ে করিয়ে দেয়া হোক।

যেই ভাবা সেই কাজ। পাত্রী হাতের কাছেই ছিল। বিয়ের চোদ্দ দিন পর আমার মেজ দেবর আবার আমেরিকা চলে গেল।

এবার শুরু হলো বৌ নিয়ে যাবার পালা। তার যেহেতু বৈধ কাগজপত্র নেই, তাই দালাল ধরা হলো। কারো স্ত্রী কিংবা বোন করে যদি পাঠিয়ে দেয়া যায়, টাকা কোনো সমস্যা নয়। অনেকজনকে ধরা হলো, ভুয়া বিয়ের কাবিন তৈরি করা হলো। অনেকের বৌ হলো। কিন্তু এতোবার দাড়ানোর পরও ভাগ্যে ভিসা জুটলো না। সবাই খুব হতাশ হলো। আমার মেজ দেবর ও তার শ্বশুরবাড়ির সবাই চায় ছোট ভাই যেন ভাবীকে তার নিজের বৌ সাজিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ কথা কাউকে বললো না। এভাবে আড়াই বছর চলে গেল। মেজ বৌয়ের মন উচাটন। এভাবে আর কতো দিন?

অবশেষে আমার ছোট দেবর বললো, অনেক তো হলো ঠিক আছে ভাবীকে আমি এনে দেবো। সে কাগজপত্র পাঠালো এবং কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকা চলে গেল। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। মেজবৌ যাবার কিছুদিন পর আমার ছোট দেবর কাগজপত্রে বৌকে ডিভোর্স দিয়ে দিল। এ কথা দুই পরিবার ছাড়া আর কেউ জানলো না।

১৯৯৮ সালে আমার ছোট দেবর দেশে এলো বিয়ে করার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি করে বিয়ে হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, তার বৌ দেখতে বেশ সুন্দরী। বৌ তখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। মেয়েপক্ষ থেকে শর্ত ছিল এমএ করার আগ পর্যন্ত বৌকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারবে না। আমার দেবরও হাপ ছেড়ে বাচলো। এতোদিনে কাগজপত্র সব ঠিক করা যাবে।

কাগজপত্র সব কিছু নিয়ে আমার দেবর দেশে এলো বৌকে নিয়ে যাবার জন্য। বৌয়েরও লেখাপড়া শেষ। কাগজপত্র ফিলআপ করার সময় একটা ঘর ছিল এ রকম যে, প্রথম স্ত্রী, না দ্বিতীয় স্ত্রী। এ ঘরটা পূরণ করার আগে আমার দেবর তার বৌকে পুরো ঘটনাটা খুলে বললো। সে খুব কষ্ট পেল এবং বললো, আমাকে আগে কেন জানানো হয়নি। মাত্র তো একটা শুনলাম, ভবিষ্যতে আরো কতো কি শুনবো আল্লাহই জানে।

সে যখন এমবাসিতে দাড়ালো তখন ভিসা কর্মকর্তারা তাকে প্রশ্ন করতে করতে নাজেহাল করে তুললো। প্রশ্নগুলো ছিল এই ধরনের – তোমার মতো স্মার্ট একজন বিউটিফুল লেডি কি করে এমন একজন লোককে বিয়ে করেছো। তুমি কি জানো, সে তার আগের স্ত্রীকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করতো? ইত্যাদি এ ধরনের অনেক অভিযোগ। অবশ্য ভিসা ঠিকই দিয়েছিল।

ছোটবৌ বাসায় এসে দরজা বন্ধ করে সে কি কান্না। তার বক্তব্য হলো, আসল স্ত্রী হয়ে আমাকে কেন কাগজপত্রে দুই নাম্বার স্ত্রী হতে হলো?

তারপর সে আমেরিকা চলে গেল। খুবই কর্মঠ মেয়ে ছিল সে। কিছুদিনের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেল। গৃনকার্ড পেল এবং একটা শপিং মলে ভালো চাকরি পেল। পাশাপাশি পড়াশোনাও চালাচ্ছে। খুব সুখেই আছে বর্তমানে।

আর মেজবৌ এখন পর্যন্ত গৃনকার্ড পায়নি। তাই যাবার প্রায় পাচ বছর পরও একবারের জন্য দেশে আসতে পারেনি। এরই নাম ভাগ্য।

প্রবাসী জীবন খুব কষ্টের। এই যে স্বজনদের না দেখার কষ্টা তা কি ডলার দিয়ে পোষানো যায়? ওদেরকে দেখতে পাই না বলে আমাদেরও খুব খারাপ লাগে। মাঝে ফোন করে যখন বলে, ভাবী আপনাদেরকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে তখন এর উত্তরে আর কিছুই বলার থাকে না।

মনে মনে ভাবি, এ রকম নিয়ম যদি থাকতো, নো ভিসা, নো কাগজপত্র, যখন ইচ্ছা আসবে, যখন ইচ্ছা চলে যাবে তাহলে আমাদের প্রবাসী স্বজনদের এভাবে কষ্ট পেতে হতো না।

গোড়ান, ঢাকা থেকে

বৃটিশ ডেমক্রেসি

– মামুন

প্রবাসে আছি অনেক বছর। ব্যক্তিগত এক কাজে আমাকে আমার এলাকার এমপির কাছে যাওয়ার প্রয়োজনে দেখা দিয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম এমপির সাক্ষাৎ সহজে পাবো না। তাছাড়া আমার এলাকার এমপি আবার বৃটিশ সরকারের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারীকে ফোনে বললাম, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। অপর প্রান্ত থেকে সুন্দর এবং মার্জিতভাবে আমাকে সাক্ষাৎকারের জন্য একটি তারিখ দেয়া হলো এবং এও বলা হলো, যদি সাক্ষাৎ করাটা খুব জরুরি হয় তাহলে সাক্ষাতের তারিখ আগেও দেয়া যেতে পারে।

আমি নির্দিষ্ট তারিখে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অতি সাধারণ একটি অফিস ঘরে এবং অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে যিনি বসে আছেন, প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি নন অন্য কেউ। কিন্তু এতো হতে পারে না! কারণ টিভি, সংবাদপত্রে ওনার ছবিই তো দেখি।

অবশেষে আমার কাছে তিনি আসলেন এবং নিজেই দরজা খুলে আমাকে নিয়ে রুমে ঢুকলেন। আলাপ শেষে আবার নিজেই দরজা খুলে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় দিলেন।

বৃটেনের সব এমপি বা জনপ্রতিনিধিরা এ রকমই করে থাকেন। আসলে জনগণের ভোটে যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন তারা ভালো করেই জানেন, জনগণই ক্ষমতার উৎস। সুষ্ঠু এবং নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে যে কেউই ও রকম ব্যবহার আশা করতে পারেন।

এবার গ্রেট বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাচ্ছি। গ্রেট বৃটেনের পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে। এ দেশের নির্বাচন আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রাস্তা বন্ধ করে নির্বাচনী জনসভা করা বা আমাদের দেশের মতো দিন-রাত প্রার্থীর পক্ষে মাইকিং করা আমার চোখে পড়েনি। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং দুই একটি ছোট লিফলেটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল জানিয়ে দেয় তাদের নিজ দলীয় কর্মসূচি। বড় বড় রাস্তায় সুন্দর এবং মার্জিত ভাষায় খুব ছোট আকারের কিছু পোস্টার আমার চোখে পড়েছে। আমাদের দেশের

মতো জাল ভোট, ব্যালট বক্স ছিনতাই, মারামারি, খুন, সংঘর্ষ, আর্মস ব্যবহার এবং মাস্তান ভাড়া করা বৃটেনের নির্বাচনে চিন্তাই করা যায় না।

নির্বাচনের দিন কোনো ছুটি থাকে না। কাজের অবসরে যে যার ভোট দিয়ে আসে। পরিবারের কেউ জানে না কে কাকে ভোট দিয়েছে। এটা এ দেশে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয়া বা প্রভাবিত করা সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হলেও বৃটেনে তা অসম্ভব। ক্ষমতা হস্তান্তর সত্যি এতো সুন্দর তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

লন্ডন থেকে

হজে

– শবনম চৌধুরী

ঘটনাটা ১৯৯৩ সালের। আমরা থাকতাম তখন সউদি আরবের নর্দান রিজিওন আলযৌফে। আমরা পবিত্র হজ পালন করি। এই হজ করতে গিয়ে আমরা কি বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম এখানে সেই ঘটনার বর্ণনা করছি।

আমার তিন বাচ্চা। মেয়ে মলির বয়স দশ, বড় ছেলে ধ্রুবর বয়স সাত এবং ছোট ছেলে দীপ্তর বয়স পাচ। আমার হাজব্যান্ড ডা. হিফজুর রহমান চৌধুরী ও আমি বাচ্চাদের ডা. মাহবুব সাহেবের বাসায় রেখে হজে যাই। হজে আমাদের সঙ্গী হন ডা. ফাত্তা, মিসেস ফাত্তা ও তাদের পিচ্চি বাবু অনিক। এছাড়া আরেক ইনডিয়ান ভাই–ভাবী। ওরা হিন্দি ভাষী ছিল।

বাসে করে আমরা রওনা হলাম। বাসে বেশ মজাই লাগছিল। ফাত্তা ভাবী ও আমরা বেশ খাবার দাবার নিয়েছিলাম সঙ্গে। বাস ভর্তি ছিল আরব। আমরা প্রথমে মদিনা শরিফে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)–এর রওজা শরিফ জিয়ারত করলাম। পরে মক্কায় গিয়ে কাবাঘর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া পাহাড় প্রদক্ষিণ করলাম। এরপর আমরা ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম।

রেস্ট নিয়ে গিয়ে দেখি নির্দিষ্ট জায়গায় বাস নেই। বাস আমাদের ছেড়েই চলে গেছে। আমরা বাস মিস করেছি। তখন আমাদের মানসিক অবস্থা কি রকম যে হয়েছে তা বলার নয়। আমাদের কাপড়–চোপড়, ব্যাগ, যাবতীয় জিনিসপত্র সব গাড়ির মধ্যে।

ভাগ্য ভালো, টাকা–পয়সা আমাদের সঙ্গে ছিল। তখন আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে মিনায় পৌছালাম। এক কাপড়ে ফকিরের মতো আমরা হজে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করলাম। হজ ফেলে কাপড় কেনার মতো অবস্থা ছিল না। মিনা থেকে মুজদালিফা এবং মুজদালিফা থেকে পুনরায় মিনাতে এসে কোরবানি করতে হয় ও শয়তানকে ঢিল মারতে হয়। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে আমরা মহিলারা যাইনি। পুরুষরা বেরিয়ে গেল।

তখন মিনাতে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। গরমে সিদ্ধ হবার জোগাড়। মানুষকে আল্লাহ কিভাবে সহ্যশক্তি দেন ভেবে অবাক হই। হঠাৎ দেখি আমার হাজব্যান্ড এবং ইনডিয়ান ভাই দুজন মাথা কামিয়ে গোসল করে নতুন আলখেল্লা গায়ে দিয়ে এসে হাজির। আর ফাত্তাভাইয়ের খবর নেই। শয়তানকে ঢিল মারতে গিয়ে ভিড়ের চাপে হারিয়ে গিয়েছেন।

মাথা মুড়ানো দুইজনকে দেখে আমরা অবাক। চেনাই যাচ্ছিল না। শুধু হাসি পাচ্ছিল। তারা আমাদের জন্য সুন্দর ম্যাকসি নিয়ে এসেছিল এবং সুখবরটা জানিয়ে দিল। সুন্দর ম্যাকসি পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম।

সুখবরটা হলো যে, আমাদের বাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। ওরা আলখেল্লা ও সাবান কিনতে গিয়ে বাসের এক যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তারাই বাসের সন্ধান দেয়। আল্লাহর কাছে হাজার শোকরিয়া আদায় করলাম। আমরাও ইতিমধ্যে নোংরা ম্যাকসি পরিবর্তন করে পাক-পবিত্র হয়ে হাপ ছেড়ে বাচলাম।

এদিকে ফাত্তাভাই খালি পায়ে নোংরা হজের পোশাক পরে মাথা না কামিয়ে এসে উপস্থিত। তার দুরাবস্থা দেখে বেশ খারাপ লাগছিল। ফাত্তাভাবী বলেছিলেন যে, হিফজুরভাই খুব স্মার্ট। তিনি নিজে পরিষ্কার হয়ে নতুন কাপড় পরে এসেছেন এবং আপনার জন্যও নিয়ে এসেছেন। শেষমেষ আমরা আল্লাহর রহমতে ভালোভাবেই পবিত্র হজ সম্পাদন করে ফিরে এসেছিলেন।

অবশেষে সেই ডা. মাহবুবভাই এবং ভাবীর প্রতি আমাদের অশেষ শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমাদের বাচ্চাদের আদর করে তাদের সঙ্গে রেখেছিলেন এবং আমাদের হজ করতে সহায়তা করেছিলেন।

গুলশান, ঢাকা থেকে